যোজন ভাইরাস

যোজন ভাইরাস

অজিত রায়

JOJON VIRUS
A Bengali Novel by
AJIT ROY

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৮
দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০০৫
তৃতীয় সংস্করণ : ২০১০
চতুর্থ সংস্করণ : ২০১৪
পঞ্চম সংস্করণ : ২০১৭
ইতিকথা সংস্করণ : ২০২০ (মুদ্রণ সংখ্যা ৫০০)

গ্রন্থস্বত্ব
রমা রায়

প্রচ্ছদ
সঞ্জীব চৌধুরী

বর্ণ-সংস্থাপন
আক্ষরিক, মানকুণ্ডু, হুগলি ৭১২ ১৩৯

ISBN 978-93-87787-XX

ইতিকথা পাবলিকেশন-এর পক্ষে ধীমান ভট্টাচার্য কর্তৃক শিমুলিয়াপাড়া, চাঁদপাড়া,
উত্তর ২৪ পরগণা, ৭৪৩২৪৫ থেকে প্রকাশিত এবং শরৎ ইমপ্রেশান
প্রাইভেট লিমিটেড, শ্যামাচরণ দে
স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩ থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ : ৯৪৩২০৮২৫৪৫/৯১৫৩৬৪৯৩২৮
E-mail : itykathapublication@gmail.com
www.itykatha.com

বাংলা হরফমালার সাড়ে একান্ন অক্ষর
আর, সেই ধুনখারা কাঠের তক্তপোশটিকে
যাদের সমিধ প্রদাহে সাঙ্গ এই যজ্ঞকর্ম

বাংলা ভাষার কোনো শব্দই সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাড়তি সমস্যা নয়, এটা প্রমাণ রাখতেই গেল-সেঞ্চুরির আটানব্বুই সনে এই ক্ষুদ্রকায় উপন্যাসটির ডিম্ব-প্রকাশ। পরে একুশ বছরে গদ্য বস্তুটি নিয়ে বিদগ্ধ মহলে অনেক কথাই হয়েছে। বাংলা বই বাজারে একজন না প্রাতিষ্ঠানিক লেখকের এই প্রথাবিরুদ্ধ গ্রন্থটিকে নিয়ে এত কথা হয়েছে, যা বিস্ময়ের। পাঠক এই উপন্যাসের বিগত পাঁচটি সংস্করণ যেভাবে নিঃস্ব করেছেন, আশা করবো এই নতুন সংস্করণও তাদৃশ সমাদর লাভ করবে।

—লেখক

"I cannot say how the truth may be;
I say the tale as 'twas said to me."
- Walter Scott

এ গল্প চোদ্দো খসড়ার পর বই।

শেষে এক মুদ্দোফরাসের চোখে পড়ে, তাইতে ফিকশান শুরু

কমলের 'পাপ' ফার্স্ট টাইম ছাপতে গেলে কমল দুঃখ করে বলেছিল, 'দ্যাখ, আমার সব রচনাই অটোবায়োগ্রাফিক। নিজের পাপের কথা আলাদা করে আর লেখা হয়নি। গুণে-গেঁথে দেখলে, এইটুকুন জীবনেও পাপ তো কিছু কম করিনি। তাই লিখে-টিখে রাখলুম আর-কি!'

'পাপ! পাপ বলছিস যে!' আমাদের সাত হারামির ঠেকে একা মদনার মধ্যে জিগির তোলার বাতিক। বলল, 'তুই কি ব্রহ্মহত্যা করেছিস? বামুনের সোনা গেঁড়িয়েছিস? নাকি গুরুর ভার্যাহরণ? তা-লে!'

না। আমি যদ্দুর জানি, কমলের এহেন কোন গতপরশ্ব নেই। এমনিতে হিন্দুমতে ঊনষাট পাপকর্ম। পরদার আত্মবিক্রয় মাতৃত্যাগ কন্যাদূষণ অভিচার, এসবের কিছুই কমল করেনি। অথচ পাপী। মহাপাপী। পাপিষ্ঠ আত্মা। আসলে, 'পাপ', কমল যেভাবে ডিফাইন করে, 'এ আরেক ইমপোস্টার। ভয়ানক ডাবল-টাংগড। ডিসিটফুল। বাইরে থেকে শব্দ দিলেও ফিট বসে না। সমীপশব্দরাও বেজায় ধাউড়, নখরাপটু।' তো, সে-শব্দানুক্রম মানলে, কমলের জীবনে সত্যিই পাপাচার এতো, যে, শাস্ত্রের পাতকত্রয়, তারাও হিক্কা তুলে গায়েবঙ্গ তবে, সেসব রেফার করলেও, বলতে হয়, তেমন প্রত্যবায় কমলের জীবনে দুটি ঘটেনি।

সে-কথা বাদে। কমল যে এখন নিজেকে পাপী-তাপী বলে পাবলিকলি প্রোফেস করছে তার মূলে তো, সেই, তার পরাদর্শি চেতনাই। কমল লোকের সব জানে। নিজেরও সব জানাতে চায় লোককে। এই তার ফিলজফি। এইজন্যে কমলের কলম ধরা। এভাবেই প্রচার করে সে। যে, মানুষ কাকচক্ষু হোক। স্বচ্ছ হোক, ট্রান্সপারেন্ট হোক। একজন মানুষ আরেকজনের গোপন-অগোপন সব জানুক। পুশিদা বা লুকোছাপা থাকে না যেন কিছু। কমলের সঙ্গে ভেতরের কমলের এই রফা। এই পরাদর্শি মতবাদের ঔপযৌগিক গুরুতা চাউর করতে দু-লাখ একান্ন হাজার হলুদ লিফলেট ছাড়ে, একদা :— 'নিহিলিস্টরা শোনো। নিঃস। আত্মস্বরণমক্ত শুনহ মানুষ ভাই! তোমাদের সাগরম্বরা ধারয়িত্রীর ইন্টেলেক্ট-সর্বস্ব হীন উপমানসিক হাল দেখে এই যুবা কলমচি নিশিদুপুরে আঁৎকে ওঠে। দুনিয়ার বামাচারীগণ আধান করো। শহর গাঁ কামারশালায় মাস-কমিউনিকেশনের নামে যা তোমরা গেলাচ্ছো, ঐ প্রাণরসরিক্ত জোড়-সংলেপ মানুষের আড়ায় মানুষকে ঠাসতে পারে মাত্র, পারস্পরিক আত্মার দুর্বিগাহ অবচেতনাকে ছুঁতে কোনক্রমেই পারে না। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির অ-ঢাকাঢাকি সম্পর্ক-একটা গড়ে তুলতে না-পারা- অব্দি সাম্যের কোঁড় খিলবে কেমন করে! কোন অলীক ঐক্যের বাণী তোমরা কপচাও? কোন তাগায় বাঁধা হবে সহস্রটি মন? এই জনিত্র ক্যান্সার! তোমরা যদি নেতির নেতি বিধানের ধার এক তিলও ধারো, অন্ততপক্ষে দ্বান্দ্বিক নেতি ও বস্তুর অন্তর্জলী ক্ষমতা বিকাশের ভূমিকা তার অস্তি-নাস্তির প্রেক্ষিতে, তাহলে, নির্ব্যাজচিক্তে কবুল তোমাদের করতেই হবে যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উদগ্র গোল্লাছুট ও জীবনের গোপন-সংগোপন সক্তাই তোমাদের এক হতে দিচ্ছে না। তোমাদের এই বিষাক্ত পুরঞ্জনী ফলের ঝাড়ে-বংশে বেড়ে ওঠা দেখে বুঝি তোমাদের প্রতি এমন ভীষণ বিবমিষা আমৃত্যু বাহিত হবে আমার। চেতনার নিঃশর্ত স্বাতন্ত্র্য কাঁঠালের আমসত্ত্ব মাত্র। পূর্ণ স্বাধীনতা বলেও কিছু থাকতে পারে না। আমি চাই ব্যক্তি কাকচক্ষু হোক। স্বচ্ছ, নির্মল, পরাদর্শি। এক 'স্ব' অন্য আরেক 'স্ব'-এর সাথে মেলবন্ধন ঘটাক। মানুষের সঙ্গে মানুষের টোটাল রিলেশানের মূল ভিক্তিই হলো, এই। মানুষে-মানুষে যে সম্পর্কচ্ছিন্নতা আজ—, তার কারণ, তারা এক অলীক বৈচিক্ত্য নিয়ে একে-অন্যের দিকে গুহ্যদেশ উলটে বসে আছে। আমার এই উপপক্তি মেনে চেতনার দূর-চূড়ায় আরোহন করতে যারা ইচ্ছুক,

আমার সগোত্র সবীর্য, এসো, এক বিশাল অজানিত আনন্দ তোমাদের জন্য অধীর প্রতীক্ষমাণ— অই সুদূর ককলিফট থেকে দূরে, দূর থেকে অদূরে, অদূর থেকে সামনে, ক্রমশ আমার দিকে আমায় এসে মিলিত হও, ... ঝাড়ুদারের স্কুইজির ঠেলা খেয়ে-খেয়ে চিলঘরের বৃষ্টিজল যেভাবে সরীসৃপ-চালে ক্রমায়ী সিঁড়িগুলি বেয়ে নেমে আসে চিরন্তন মাতৃক্রোড়ে। অবিকল সেইভাবে।

কমলের আমি কী-না জানি। সব জানি। ওর নঙ্কুর কালার অব্দি আমার জানা। ও যে আমার ক্লাশমেট থেকেছে সেই ডাউন টু থেকে টপ টোয়ার্ডস। ইস্কুল কেটে দীঘির কিনার। হাঁটুজল পেরিয়ে সিয়াকুল বন। বনে ঢুকে যে যার মনের মাফিক ঘুরে বেড়ানো। সব কমলের সঙ্গে। গাছে গাছে তিতির বটের ভারুই ঘুঘু সিপাহি বুলবুল। কাঁঠালগাছের গুঁড়ি আঁকড়ে গিরগিটি মোল্লার ঠায় বুক-ডন। আমরা ডালে ঝাড়া দিয়ে ভুঁই থেকে কুড়োই বদরীফল, টোপাকুল। ফিরতি পথে ওপরের কাপড় ডাঙায় ছেড়ে, জলে। শ্যাওলা শেকড় গুগলি তুলি। নিম্না। ধরি পরস্পর জলের তলায়, শেষে মাপামাপি শুরু। সবই তো, এই কমলের সঙ্গে।

গোদের মধ্যে মদনা ছিল খানিক ভেকুয়া টাইপ। নাইনে উঠেও ভাবত বউগুলো উপুড় হয়ে শোয়। কমলই ভুল শুধরে দ্যায়। বলে, বউরা বাঁ-দিকে শোয়। কেন, বাঁ কেন? কেননা ওতে হিসি বেরিয়ে যায় না, হাজমা ভালো থাকে। আমাদের মধ্যে কমলেরই বুদ্ধি ছিল একটু খোলা। কমলই শিখিয়ে দ্যায় বীর্য কী আর কীভাবে নিষেক করতে হয়। একদিন প্র্যাকটিকাল রুমে বসে টেস্টটিউব হাতে মদনা খুব করে পানাচ্ছে, খপ করে হাত চেপে ধরল বেগুনিয়া স্যার। 'জানিস, চল্লিশ ছটাক রক্তে এক ভরি সিমেন, তুই এভাবে নষ্ট করছিস, গাবর! ছাড়, ছাড় বলছি—'

মদনার তখন হয়ে আসছিল। 'শালা হারামি ভোষড়া কাঁহিকা!' ...

আমাদের আলজিবে বঙ্গেতর ভাষাপদ্ধতি জড়াতে লেগেছিল ক্রমে। এ ছিল কমলের সাথে দীর্ঘ সঙ্গযাপনের নাতিজা। কোথায় কোন নতুন খিস্তি রিলিজ করল, সট করে কমলের কল্লায়। আর ছিল সেক্স নিয়ে আয়ুসম্মত আয়োজন। একদিন শোনা গেল নাসিরদের ছাদ থেকে নাকি প্রচুর পাছা দেখা যায়। গোয়ালাপাড়ার মেয়ে-বউরা ওদিকের ঝোপ-ঝাড়ে হাগতে যায়, ওদের লজ্জার থাকবস্তি নেই। 'হেই তানপুরা সাইজ'— নুনা সার্কেল এঁকে দেখালো— 'আয়েসশা সোনার খনি। লে মার।'

গুলিটা ঠকাস করে গিয়ে লাগে ডান্ডায়। মদনা আউট। 'আইব্বাশ!'

ভচি দান চালার জন্যে রেডি। দু-হাতে ডান্ডা ধরা। হাঁটু বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে, কোঁৎ পাড়ার মতো থোবড়া—। 'মাইরি?'

আমরা হৈ-হৈ করে পাছা-অভিযানে চললুম। নীমফল কুড়োনোর বাহানায় নাসিরদের বাড়ি। ওদের উঠোনে নীমগাছটার মে-জুন আসতেই রোখ চাপে। নাগাড়ে পাতা ঝরায়, আর কাকফল। আঙনা ভরে যায় হলুদে। আমরা দরজা ঠকঠকিয়ে ডাস্টবিনের আড়ালে। নাসিরের খালি-বী নাসিমাবানু চবুতরের দড়িতে টাঙানো তার চুদক্কড় খসমের আন্ডারওয়্যার তুলতে এসে ভেতর থেকে চেল্লায়, 'আয়ে গওয়া হরামিয়ন সবঙ্গ একে মারে জান আফত-মা হ্যায়।'— আমরা তখন পাঁশকুড়ের হেপাজতে বসে, খুব হিহি-খিখি।

করিনি কী! বসাক কোত্থেকে একঠোঙা শুকনো মহুয়া ম্যানেজ করে নিয়ে এলো। শালবনের পুরনো ঠেকে। তাইতে ইস্ট মিশিয়ে ফারমেন্টেশান কায়দায়, মধুমাধবী। ভচি বলল, 'আজ আমি ফিরতে পারব না রে। বাবা শালা কিলিয়ে মেরে ফেলবে।' ... তো, সে-রাতে বাদাড়েই কাটিয়ে দিলুম সাত রয়স্টারার। বিল্লু বলল, 'চ, শ্রীকান্ত-শ্রীকান্ত খেলি। আমি নতুনদা।'

কমল আগেভাগে বলল, 'আমি শ্রীকান্ত।'

আমার গায়ের রঙটা কালো ঘেঁষে। বাঁশির মতো না হলেও, নাকটা কিছু ছুঁচলো। চওড়া কপাল। আর মুখে দু-চারটে বসন্ত গোছের স্পট তখন থেকেই। তাছাড়া ওদের চেয়ে বয়সে আর হাইটে আমি একটু বেশিই ধুম্বা। সবদিক থেকে একদম ইন্দ্রনাথের চোথা। বললুম, 'আমি ইন্দ্র।'

মদনা বেফাঁস বলে বসল, 'আমি তালে শ্রীকান্ত বহুরূপী।'

ব্যাস, আর যাবে কোথা। আমরা সদলবলে ক্ষুর তুলে একজায় ওর পিঠে : দুমদুমাদ্দুম দমাস দমাস ...

তখন মাঠে-মাঠে শান্তিগোপাল, স্বপনকুমার। মথের পারা গোঁফ, হিটলার। গোলালো চশমা, নেতাজী। আমরাও পেয়ারাতলায় ছেঁড়া তেরপল খাটিয়ে যাত্রা-যাত্রা। আমি হিটলার, নুনা লেনিন, কমল মাইকেল মধুসূদন। পাশাপাশি ঘুড়ি, চু-কিৎকিৎ, আইশপাইশ, গাব্বু, হাতলেক্তি। কঞ্চি হাতে বিহারি-বাঙালি। হোমিওপ্যাথির শিশিতে ইন্দ্রগোপ পোকা। গিরগিটির ল্যাজে উল বেঁধে, চল মেরা ঘোড়া হ্যাট হ্যাট ...

ঝকঝক করে বোর্ডের পরীক্ষা এসে গিয়ে সব বানচাল হয়ে গেল। দেয়ালের ধারে সিট না পড়লে পাশ করা বেজায় হুজ্জত। ফলে, খুব করে চাদা তুলে পুজো করে নিলুম একচোট : বোলো-বোলো সরসতী মাই কী! জোয়। বিনা পানি কী! জোয়। আসচে বছোর— আবার হোবে!

কমলকে ওসব লাফড়ায় পড়তে হয়নি। ওর মেজোমামা ছিল হেডস্যারের ছোট জামাই, ফলে এক চান্সেই ফতে। আমরাই দেড়-দু-বছর পিছিয়ে থাকলুম।

এহবাহ্য। আমরা, মানে, আমি বসাক মদনা নুনা ভচি বিল্লু তখন ম্যাট্রিকুলেশন, ইন্টামিডিয়েটের ঘাটে দাঁড়িয়ে যে-যার মতন করে ভোঁস-ভোঁস ধোঁয়া ছাড়ছি, একা কমলকে দেখি অবিকল পাল-তোলা পোতের চালে বাংলায় অনার্স বাগিয়ে রায়বেঁশে কলম ঘোরাচ্ছে। ও-হো, ইজন্ট ইট মিস্টিরিয়াস, বারমুডার পরে—?

মানে, অ্যাড়া, আমাদের এড়ু চক্কোত্তি কিনা সা-হি-ত্যি-ক! ভাবা যায়?

ভাবা যে একেবারেই যায়নি, সে-বললে মিথ্যে।... 'তোমরা দেখিও, আমি বড় হইয়া লেখক হইবঙ্গ'— কমলকে দেখতুম, প্রত্যেক দফা, অবিকল দু'বার করে পড়ে যেত লাইনটা।

কমলের লেখক হবার ছিল।

তো, পে-অর্ডার আর ফর্ম-ফিলাপের ঐ ম্যাদামারা উত্তেজনার বয়সেই বাংলা সাহিত্যের সাজানো বাগানটা টার্গেট ব'নে যায় কমলের। প্রথম প্রথম কলকাতার বইমেলায় যেত স্রেফ ধুতিতে কোঁচা-মারা সাহিত্যিকদের আওয়াজ দেবে বলে। ভেবে ভেবে ওর পাছা শান্ট মেরে যেত যে এত গুচ্ছের মানুষ, এত ভিড়, এত কাতার, এরা কি সম্বৎসর বই পড়ে? নাকি, পড়ার মতো তেমন-হারে বইই আছে বাংলায়! কমল ভাবত বুকফেয়ারকে শহর থেকে তুলে কোনো টাঁড় বেজন্মা জায়গায়, যেখানে অন্তত কলেজ স্ট্রিট নেই, নন্দন কিংবা রবীন্দ্রসদন নেই, এমন কোথাও কোনো বাঁজা গাঁয়ে যেখানে হাঁটার উপযুক্ত গোড়হর অব্দি নেই, মাছফ্রাই বা টয়লেট দূরস্থ, যেখানে মানুষ ফুটো ঠং নিয়ে হাগতে যায় মুড়োনো-ধানের খালিয়ানে, সেইখানে শিফট করে দিলে বরং বাংলা বইয়ের ইজ্জৎ কিছুটা বাঁচতো। কলকাতায় হলে তা হওয়া উচিত কেবল বাঙলার বাইরের বাংলা বইয়ের মেলা— ধরা যাক ঝাড়খণ্ড, বিহার কিংবা ইউ-পির বাংলা বই। আপনারা বছরভর যা গু-গোবর ঘেঁটেছেন, একলপ্তে হাপিস। ভিড়ে-ভিড়াক্কার হয়ে যাবে ক্যালকাটা বুকফেয়ার,— কমলের তো মতিপ্রকর্ষ বলে, কলকাতায় বছর-পাঁচেক বহির্বঙ্গের বইমেলা হলে বছর-ছয়ের মাথায় নন্দনের গাছপালা কেটে আরেকটা প্যারালাল আকাদেমি খুলে যাবে, যেতে বাধ্য, এবং তার নাম হবে 'অ্যাকাডেমি ফর বেংগলি ডায়াসপোরা'। তখন এই কলকাত্তাই গপ্পো-নভেলের হাওড়া-শেয়ালদা খেলায় বাট লেগে যাবে।

এভাবে ভাবতে ভাবতে একদিন বাংলা লেখালেখির মিহিদানি লাড্ডুর ইমেজটাই ফাঁস করে ফেলতে চাইল সে। পরবর্তী লিফলেটে কমল লিখল : 'হে বঙ্গভাষী পাঠকগণ! আপনারা শীতের উলবোনা কাঁটা-দুটো থুয়ে একবারটি বেরিয়ে আসুন। ফুচকা, বেনফিশ, নেসকাফি আর কতদিন আপনাদের হাজমা দুরুস্ত রাখবে? এইবার কুঁয়োর ঢিবি উঁচিয়ে ওয়াইড ভারতবর্ষের গ্লিম্পসেজ দেখুন! নিজেদের পাঠ-দাঁড়াকে জীবনবাবুর মিঠে-মেয়েলি ভাষার ঘুঙটে ঢেকে রাখবেন না প্লিজ, খানিক হরিয়ানভি জাট, ভোজপুরী লেঠেত হোন। আপনাদের উপাস্য কবিবৃন্দ অ্যাদ্দিন যা লিখে এসেছেন তা নিয়ে বিগত প্রজন্মেই মারাঠি কণ্ঠে মনকেমন গান রিলিজ করে গেছে, শেয়াল রাজার বাঁসুরী আর কতদিন শুনবেন? একজন আলখাল্লাধারী দেড়েল বুড়ো

কাঁড়ি-কাঁড়ি গান আর পদ্য লিখে আপনাদের আপাদমাথা ঢেকে দিলে, তো এখন ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস আপনি চাঁদি বুঝবেন? যে মানুষটার 'সংঘবদ্ধ শিক্ষা'র প্রোগ্রামিংই ছিল কিনা ঘোর সংশয়, সেই কিনা জমিদারির স্টিম্যুলাসে একখানা শিক্ষানিকেতন খুলে আপনাদের গুরুদেব হলেন? তল্পিবাহনের এই বন্দিসা থেকে বাঙালিকে খালাস পেতে হবে। এবং, মাইন্ড ইট, কপিরাইট নয়, কপিরাইট নয়,— সর্বাগ্রে নুচে ফেলা জরুরি এই তালিবানি বোরখা।

গুরুভীরু লোকজনদের কাছে এসব কথাবার্তা রিগম্যারোল ঠেকতে পারে, তথাপি কমল দুরাসদ। সে তো আরও বলে, বঙ্কিম যা-ও বা কিঞ্চিৎ চেষ্টাবেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বাঙালির তুল্যমূল্য গেঁতো আর পিউরিটান জাত তো দুটো নেই, তাঁরা সেটাকে বাউনবাড়ির 'মূর্খ অপগণ্ড' ডেপুটি ছোঁড়ার 'অর্বাচীন কাণ্ড' বলে ভর্ৎসনা দেগেই পোঁদ উলটে নিলেন—। তো, কমল বলে, অই পাগড়িওলা সম্রাট, তার-বাদে গোটা বাংলা বাজার এই ক'দিন আগে পর্যন্ত শরৎ চাটুজ্জের ভাজা ঢোকলা বড়াই নুন-মরিচ যোগে তকসিম করে এসেছে। তবে, পরের দিকে আরেক চট্টোপাধ্যায়, কমল গোড়ার দিকে যাঁর 'সমবেত ব্রেসিয়ার ও অন্যান্য হেঁশেলের গল্প' পড়ে খানিক টালমতন খেয়েছিল, কমলের বেহদ খেদ, সে-দিব্যচক্ষুধারীকে এতখানি মায়াঁমুঁহা হতে কে দিব্যি দিয়েছিল! আসলে, কমল যে-নিষ্কর্ষে গেল,— এই মন, এই মন হলো-গিয়ে যত নষ্টের কালপ্রিট। মনেই খেলো বাঙালি লেখকগুলোকে। মায়, গিন্নির আঁচলের খুঁটে, আচারের কৌটোয় তারা মন খুঁজে বেড়ায়। 'শরীর, শরীর, শরীর'— তিন খেপে উচ্চার্য বয়েতখানা তিন-তিন দফা কি এমনি-এমনি লিখেছিলেন মানিক বাড়ুজ্জে? ঐ একজনই যা-একটু কবুল করেছিলেন, তারবাদে ফের সবাই মন নিয়ে পরেশান। যেন মন লিখতে পারলেই 'ক্লাসিক'। বেশ্যাবাড়ি গেল মনের খোঁজে, মদ গিলল মনের খোঁজে, বাঈজির মন পেতে আকখা জীবন তবলা পিটেই কাটিয়ে দিল— ভাবল বাঘ মেরেছি। বোঝো কিসসা!

ফলে একটা রিজিডিটি গড়ে উঠেছিল, যে, এ ভাষায় এমন কিছুই লেখা হয়নি যা তার খাদ্য। কমল বলত, 'দ্যাখ, খারাপ বইয়ের একটা বাঁচোয়া যে পড়তে হয় না। কিন্তু যে দু-চারটে ভালো বই আছে, সেগুলো পড়, তুরন্ত ফুরিয়ে যায়। তখন ফের কী-পড়ি কী-পড়ি ব্যাপারটা ডেভালপ করে। আমি এই দুটোর মাঝ-বরাবর একটা-কিছু লিখবঙ্গ যা কেউ লেখেনি। যেমন ধর, এক যে ছিল রাজা, সে বেজায় গরিবঙ্গ কিম্বা চৌত্রিশ ইঞ্চি লম্বা এক স্বাস্থ্যবতী কুমারী চুলের অন্তর্জ্বালা। ব্রেসিয়ারের স্ট্র্যাপ ও ড্রাগনের প্রতিহিংসা। ছোবলের রতিবিজ্ঞান। হিংস্র দাঁতের একুশ বছর। সামুদ্রিক নকশাল বা ব্যাঘ্রশিকার। এইসব হবে আমার গল্পের পেটেন্ট বিষয়।'

কমল হামেহাল এইরকম। বিলকুল এই রকমই লিখত আমি যখন ওকে প্রথম পড়ি। ঝাড়খণ্ডী মেড়ো হিশেবে কলকাতার ধুতিতে কোঁচা-মারা সাহিত্যিকদের গালিম জমঘটে পৃথক ঠেক পাওয়ার তন্বিতে সে যখন বেজায় হন্যে, 'নতুন' বা 'পরীক্ষা' বাবদ আগ্রহ বঙ্গ বালকদের মধ্যে সেখানে ডেভালপ করেনি তখনো। স্রেফ দেড়-দুজন বিরল রাগী যুবা বাঙালি লেখকদের 'বা-লে' অ্যাব্রিভিয়েশন দেবার চেষ্টা করেছিল, ব্যস, ঐ পর্যন্ত। স্বভাবতই, কমলের সদাচৈক্তিক রোখ যেটা, সে যেতে চেয়েছিল ঐ বাহান্ন এপিসোডের বাইরে। নির্ভীক ঝলক নিয়ে মারতে চেয়েছিল সটান হাঁটা, পচা করিডরের শোকার্ত-সব আত্মার রাশ ঠেলে, এবং একা। কমল ওদেরকে ভাষা বোঝাতে গিয়েছিল, আর শব্দের বুনন। কোদণ্ড তুলে কেউ তাকায়নি পর্যন্ত। ক্রোধ ক্লেশ করুণার জোর-একটা সার্ত্রে-লাথি হেঁকে,— তদুপরি পাছা প্রদর্শন করে, কমল ফিরে আসে নিজস্ব কুলায়। তার মাথার পেছনে অদৃশ্য জ্যোতির্বলয়টি সেই প্রথম চোখে পড়ে যায় আমার।

আসলে, কমলের 'হাইট' একটা প্রশ্নচিহ্ন হতে পারে, যাকে ডিকোড করার কিম্বা রাহাদারি দেবার লোক সম্ভবত এখনও বাংলা বিতর্দিতে পয়দা পায়নি। এ জিম্মাও খোদ কমলের। এ ভাষায় কেউ কখনো লেখেনি এমন বেপোট লেখা লিখতে চেয়ে প্রথমত নিজের ভাষাটাকেই সে বেপোট করে ফেলেছে। এমন বেপোট, এমন আনখাপ্পা যে তা পড়তে গিয়ে বিশুদ্ধ-মণ্ডলের পুরুত-উলেমাদের যাকে বলে তৎসমে হাঁকুপাকু এবং তদ্ভবে পোঁদে বাঁশ হাতে লণ্ঠন হবার যোগাড়। তেনাদের বানানো নির্দেশপঞ্জী, অনুশাসন আর মডেল মান্য

করে না-লিখলে তো তেনারা সেই সাহিত্যকে ডিকোডই করতে পারবেন না, পারেনও না, অধিকন্তু ভাষাপরিচ্ছদে কিঞ্চিৎ বেশাসন দেখলেও তাঁদের মূল্যবোধ ও নন্দনতত্ত্ব অসহায় লেভেলের হাহাকার করে ওঠে। সেই লেখা তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য, অতএব ব্রাত্য সুতরাং পরিহার্য। বাংলা সাহিত্যের তাজপোশী প্রদানের ইজারা যেহেতু তাঁদেরই দখলীকৃত, ফলে তাঁদের ভাষা-স্ট্রাকচার নকল করা বেহদ জরুরি। কমল যেটা হেলায় নাকচ করেছে। তার আঁতে যেসব কথা আর যত রকমের শব্দ কিলবিল করে সেগুলো প্রাকৃতিক তথা টাঁড় তো বটেই, তদুপরি কমলের কলমে শান খেয়ে ভয়ানক মারকুটে,— এমনকি, মাথায় ফেট্টি আর গলায় রুমাল বাঁধা ঐসব মাস্তান শব্দগুলোকে দেখে বাবু-পণ্ডিতদের কৃত্রিম, বানানো, ভদ্রায়িত বিশুদ্ধ ভাষার পাছা ঢিলে হয়ে যায়। এমত শব্দ-মাফিয়াকে স্বীকৃতি দেবে কোন আহাম্মক! সুতরাং কমলকে রিকগনিশান পেতে তার জীবনপদ্ধতির রফা-নিকেশ হয়ে যাবে সেটাই তো স্বাভাবিক। এমনকি, তার চতুস্পার্শ্বস্থ ভুল বানানওলা থার্ড শ্রেণির লেখকদের আবহমান ভুরুকুঞ্চন আর উপেক্ষা,— তা থেকেও তার ছাড়ান নেই। এতখানিও সে ভেবে রেখেছে।

কমল এখন সাঁইত্রিশ। এই সেই ব্রাহ্মবয়স যখন নিদ্রাহত বিষ্ণুপ্রিয়ার অলকপার্শ্বে খাঁড়াউ-জোড়া খুলে রেখে মাঝরাতে নিমাই ফেরার। কিম্বা হরিশ মুখুজ্জের কেসটা রেফার করলেও, অন্তত হিশেব মেলাবার খাতিরেও, বলা সঙ্গত, না, কমলের সেরম কোনো প্রবলেম নেই। অন্তত এখন নেই। কাউকে ছাড়ার কমল কে? কে-ই বা কমলের ছাড়ার অপেক্ষায়? এখন কমলের মধ্যে কোনো আততি নেই, ছটফটানি নেই। তাড়া নেই। দিব্যি আরামে টুকটুক করে সে লিখে যাচ্ছে। কমলের বই আছে, বউ আছে, বুতরু আছে। কমলের ডিউটি আছে, আর আছে বড়বাবুর ধমক। বন্ধু আছে। আড্ডা আছে। আর, ফাউ হিশেবে আছে লেলিহান সবুজের অথৈ নৈরাজ্য।

বাস্তবিকই, কমল যেখানে বাস করে, তাকে ঘিরে একরের পর একর শুধুই সবুজ। ওদিকে মানুষ কম। মানুষের আনাগোনা। এখন শ্যাওলা-ধরা ইটের মতো মাটি কেবলি সবুজে ঢাকা। যে-কোনো-রেঞ্জের বাইনোকুলার ছাড়াই ওর বাড়ির লাগোয়া টেরেস থেকে দেখা যায় আলবাল কেদারখণ্ডের পর ওই খয়েরি-কালো সবুজে ঢাকা বার্নটসিনা পাহাড়ের ইনবিল্ট কেমিস্ট্রি। সানুদেশে, প্রতীতি নয়, সবুজ ঢেউ ভাঙে মাটি। সবুজের জায়ান্ট ঔরস থাবা পেয়ে ক্রমে ডুংরি বা টিলায় রূপান্তরিত। সেই শাশ্বত সমুদ্রের ধার ঘেঁষে আদিগন্ত ঘনসবুজ ধনাঢ্য প্রকৃতির কোলে আদর খেতে থাকা এক-একটি ঘুমপাগল পল্লী, মাদলের ধুমুল ব্যতিরেকে যাদের জাগাবার কেউ নেই, আজও। সেখানে আলো নেই, রাস্তা নেই, বাজার নেই, কাছারি নেই, দুঃখ নেই, চিৎকার নেই, চিকিসুর নেই, কসমেটিক যৌনতা নেই, ময়লা নেই কোনো। আছে শুধু ঘন কচি হলদে বুনো কালচে কর্কশ তাজা বটল ফৌজি মোগলাই ইত্যকার সবুজের বিস্তীর্ণ বাদাড়।

কমল ঐ সবুজ দেখে দেখে সমীপ শব্দ বানায়। কমলের গল্প যেদিন প্রথম পড়ি, সবুজ বিষয়ে আমার প্রাক-প্রত্যয়ের মাথাই থ্যাঁতা হয়ে যায়। সত্যি, এত বড় গাছুড়িয়া লেখকের কপি, আমাদের হরাইজনে, আর দ্বিতীয়টি নেই। বলতে কি, বাংলার মুখ কমলই আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে। এবং, খোমায় থাবড়া মেরে—। এই দ্যাখ গিরিমাটি, অ্যালামাটি ঐ। এঁটেল পোর্সিলেন দোরসা মাটি। অই দ্যাখ স্বচ্ছঃ জল, গণ্ডশিলা, কালভার্টের তলায় পড়ে-থাকা নিঃস। উপলখণ্ড। দোয়েলের ডাক শোন ঐ, ঘুঘুর কুহর, গোরুর ঢং। চিনে ফ্যাল গোড়হর, চট-সে। একে বলে ফলসা, এই হলো আমলাতি। এই যে দেখছিস, এর নাম ছাঁচিকুমড়ো, খাস তো তুই! আর খোকসা? পেঁয়াজকলির ঝুঁটি গুঁজেছিস ভাসে? ধুন্দুল, পটোল পাতা চিনে নে। একে জান, শোলাকচু। ওই যে দেখছিস, হিলমোচিকা। সুন্দর নাম, তাই না! পায়ের ঠোকর খেয়ে এই-যে গড়িয়ে পড়ল পাথরটা, ওর গায়ে শ্যাওলা জমে না। জেনে রাখ, এর নাম পিটুলি। ওদিকে পরপর বামনহাটি, আঁকোড়, হাতিশুড়া, সিনকোনা, কাজলি। হোগলের গোছা, বাঁশড়া আর ওই-যে ছুঁচলো-মতো, ওর নাম পোঁদবাঁশ—। সবই তো কমলের কাছে শেখা। কমলের এটা একটা দিক। মস্ত দিক।

ঐ গাছ। ঐ গাছই মাঝেমধ্যে গিরমি রেখে নিত কমলকে। তারপর বহুদিন বেপাত্তা। ফের এমনি, বিকেলে একটু মন খারাপ নিয়ে হাঁটছি, হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

জিগ্যেস করলুম, 'কীরে, অ্যাদ্দিন পাত্তা নেই! করছিসটা কী?'

কমল বলল, 'সিমলডির বাদাড়ে ছ-কাঠা জমি কিনেছি। সারাদিন মাটি কোপাই, আর রাতের বেলা রিসার্চ।'

রিসার্চ! কিছু বুঝতে অসুবিধে হলে আমি আবার নুনু খোজাই।

কমল বলল, 'চল, তোকে সব দ্যাখাচ্ছি।'

স্কুটারে ফার্স্ট গিয়ার দিয়েই কমল চালু হয়ে গেল,— 'শোন, গোড়া থেকেই বলছি তালে। বাবা আমার নামে কিছু টাকা ফিক্স করে রেখে গেছিল, শুনেছিস বোধায়। ভেবেছিল চাকরি-বাকরি না জুটলে ব্যাটা মনিহারির দোকান খুলে খাবে,— কিন্তু আমাকে তো জানিস, পায়ের তলায় সরষে আছে বলে তোরা আমাকে ক্ষেপু চক্করভর্তি বলে ক্ষ্যাপাতিস। আমার তো বাঁধাই ছিল গৎ, ঐ, লদি লদি ঘুরে বুলি, আর জঙ্গলে, অর্জুন বিষাদে। হুট করে মাথায় খেলল, বাগান করব তো, যেটুকু টাকা, শহর ঘেঁষে তো জমি হয় না। তাই পিছোতে পিছোতে এই অ্যাদ্দূর। দেখলুম সবুজে ছাওয়া এবড়ো-খেবড়ো অনেকখানি পাথুরে জমি। ভালো লেগে গেল। পেয়েও গেলুম বাংলার দরে। সঙ্গে সঙ্গে হেজের ডাল পুঁতে বেড়া দিয়ে দিলুম। মাটি সেনে দেয়াল তুললুম, খড়ের চাল। গোটা দিন মাটি কোপাই, গাছের যত্ন, আর রাত হলেই বীজদানা নিয়ে রিসার্চ।'

অ্যাকসেলারেটারে হেই-হেই মোচড়, আর ক্রমশ শহর ছাড়িয়ে গ্রামের দিকে। এদিকটা কখনো আসিনি। এত সবুজ ছিল বলেও কেয়াস ছিল না। শহরের মেওয়া খেয়েও পল্লীমায়ের আঁচল-ধরা। সব উঠোনেই কাঁকরোল, চিচিঙ্গা, বেগুন, ঝিঙে, ছাঁচিকুমড়ো, পইকচু। আর, মহুলের বাসে কঙ্কেরা দোলে। হীরক রোড ধরে সোজা ধেয়ে বাঁ-হাতি টার্ন নিয়ে সিধে ক্রমশ ডান জ্যা ভাঙতে ভাঙতে আরও কিছুটা গিয়ে আচকা বাঁ-পানে মুড়ে খানিকটা ছুটেই ওথলানো দুধের মতো পিচসড়কটা একজাই ফুড়ুৎ। উল। মোরামবিচিতে টায়ার ছোঁয়াতেই আকাশ-খিলান থেকে ধোঁয়ার ফাঁস গলায় মেরে ঝুপ করে ঝুলে পড়ল সাঁঝবউ। এদিকে বিজলির খুঁটো এসে পৌঁছয়নি এখনো। অনিবার কনসার্ট, ঝিঁঙুরের।

স্কুটার খাড়িয়ে রেখে বাঁশের গেট খুলল কমল। একটা ছাগলের বাচ্চা তিড়িং করে উড়ে এলো। ক'টা শকুন হেঁটে গেল ঝোপের পাশে। অন্ধকার মাখা মিহি আলোয় কমলের ছ-কাঠার বাখারিঘেরা বাগান। সবুজ শসা ভিণ্ডি চালকুমড়ো জোনার। মুলো বিট গাজর শালগম। করলা কাঁকরোল ধুন্দুল কুঁদরি। ওদিকে বেগুন টম্যাটো, গাঁটকচু, সুষনি। আর বড় বড় হরেক গাছে আম, জাম, কাঁঠাল, কলা আর ঘোড়ানিম। ওহো, আমার চোখ যে এরপর ভুঁয়া হবে তাতে আর আশ্চর্য কী। গেট খুলে ঢুকতেই গুচ্ছ ফুলের সুবাস একজাই নাকের মধ্যে ঢুকে ভেতরটা ছেয়ে ফেলে সহসা।

'এসব তোর?' মানে, 'এসব করেছিসটা কী!'

'দাঁড়া না'— ঠ্যাঙ মুড়ে স্কুটারটা স্ট্যান্ডে থুয়ে, কমল কাঁকরের সরু রাস্তা ধরে আমাকে নিয়ে চলল বাড়ির দিকে। 'সকাল হোক। দেখে-টেখে তাক লেগে যাবে তোর। এখন অন্ধকারে কী বুঝবি!'

'সকাল!' আমি বেশ ভড়কে,— 'এই ভূতের গোডাউনে আমি রাত কাটাবো নাকি ভাবছিস?'

'আহা,'— দরজার তালা খুলতে খুলতে কমল বলল, 'ভালো না লাগলে চলে যাস। আমি বাড়ি দিয়ে আসব। এখন খালিপিলি টেনশন করিস না তো! নে ঢোক।'

ভেতরটা পুরোই অন্ধকার। আমাকে ঢুকিয়ে, সর্বাগ্রে যেটা, কমল দেশলাই বের করে ল্যাম্প জেলে দিল। জেলে দিতেই ভুস করে একটা ছোট্টো ল্যাবরেটারি ভেসে উঠল। দুটো ফিতের খাট, পাশাপাশি। চাদর বালিশ, মশারি, দুমড়ে-মুচড়ে। এ-বাদে সবই ছেড়ে-আসা সেই বেগুনিয়া স্যারের প্রয়োগশালা। ঢাউস ঢাউস

দু-খানা টেবিলে যত্রতত্র নানা মাপের বোতল, টেস্টটিউব, রেটর্ট, পোর্সিলিনের বাটি, বিকার, কেমিক্যালের শিশি ছড়ানো। ওষুধ-ওষুধ গন্ধ। বড় একটা জানালা, তাতেও নানা সাইজের মাটির বাটি, হরেক কিশিমের বীজদানা।

এসব কী, কী-জন্যে কিছুই বুঝছি না তখনো। কমল বলল, 'এই হচ্ছে আমার রিসার্চ ইউনিট। এটা না করলে ঠিক মজা পেতুম না, জানিস। আমার জীবনে রিসার্চ বা এক্সপেরিমেন্টের একটা মেজর রোল আছে। একদিন হলো কি, শোন, আষাঢ়ে বুনেছিলুম পালংয়ের বীজ, পাশেই পড়ে ছিল বিটের বাচ্চা। হঠাৎ নজরে এলো, দুটো গাছ আপনা থেকেই হাইব্রিড হয়ে গেছে। বিটগুলো হলো মুলোর সমান লম্বা আর পাতাগুলো মানের মাফিক প্রকাণ্ড। ব্যাস, বুদ্ধি খুলে গেল।' ... কমল বলা চালু রেখেছে,— 'ফুলকপির সঙ্গে বাঁধাকপির সংকর করালুম। সবুজ রঙ, কড়াইশুঁটির স্বাদ। নেশা ধরে গেল। সেই থেকে রিসার্চ। কত কী করলুম! ইটালিয়ান ব্রোকোলির সাথে ঝাড়খণ্ডী ফুলকপির ব্রিড করালুম। প্রথমে দেখি বুনো বুনো ঝাড়খণ্ডী গন্ধ। পছন্দ হলো না। ব্রোকোলির সঙ্গে সংকর করালুম হেডলেস বাঁধাকপির। মোটামুটি মনে ধরল। ফের ক্রসবিড করালুম দিশি ফুলকপির সাথে। ফ্যান্টাস্টিক রেজাল্ট।'

'য্যাঃ! এতশত তুই করেছিস?'

'অই তো। জানি, বললে বিশ্বাস যাবে না। ঠিক আছে, দাঁড়া'— বলে কুলুঙ্গি থেকে একটা আপেল-সাইজের বড় টম্যাটো এনে হাতে দিল, 'নে, খা। খেয়ে বল, কী।'

খানিকটা খেলুম। 'আরে, এ তো অদ্ভুত! আঙুরের স্বাদ।'

'হ্যাঁ। ঘরে কিছু আঙুর এনে রেখেছিলুম, খেতে ভুলে গেছি, পচে গেল। ফেলে দিতে গিয়ে ভাবলুম একটা নতুন পরীক্ষা করে দেখি। বাজার থেকে আরও ক-রকম আঙুর কিনে এনে মিশিয়ে দেখি আঙুরের মতো থোলো-থোলো হচ্ছে। কিন্তু যা চাইছি ঠিক পাচ্ছি না। রেগে-মেগে ফেলে দিলুম বাগানে। টম্যাটোর বীজ ছড়িয়েছিলুম। মাস খানেক বাদে দেখি চারা গজিয়েছে। আরও মাস-টাক বাদে ফল ধরা শুরু। পাখিরা খুঁটে খাচ্ছে। সার-জল নিয়ে বড় করলুম। এক-একটা ইয়া আপেল সাইজ। ওই তো তুই যেটা খেলি। পুরো আঙুরের মতো স্বাদ, না? টম্যাটো আঙুর। ফলে নাম দিলুম টাঙুর।'

'মাইরি। এ তো তাজ্জব ব্যাপার রে!'

'তবে আর বলছি কী। কলার সঙ্গে, আপেলের সঙ্গে, লেবুর সঙ্গে, কত রকমের যে আঙুর বানিয়েছি, না খেলে তোর বিশ্বাস হবে না। দাঁড়া, একটা খাওয়াচ্ছি।'

একটা কাগজি লেবু তুলে নিয়ে এলো। মুখে দিয়ে দেখি খানিকটা টকটক কিন্তু ভেতরটা আঙুরের মতোই মিষ্টি—। 'এর নাম লেঙুর। ভালো না?'

'যাহ শালা! করেছিসটা কী?' আমার তো আক্কেল গুড়ুম হবার যোগাড়।

'আরও আছে।' জামাটা দেয়ালের খুঁটে টাঙিয়ে রাখতে রাখতে কমল বলে,— 'প্রথমটায় মায়া-মায়া রহস্য-রোমাঞ্চ গোছের ফিল হচ্ছিল। আসলে সবই রহস্যময় প্রকৃতির লীলাখেলা, আমি তো স্রেফ তাঁর ইশারায় খেলে যাচ্ছি। ঝাড়খণ্ডের মাটি, বুঝতেই পারছিস কী রুক্ষ। কিন্তু বিশ্বাস কর, তোকে সকালে দেখাবো, নৈনিতালের পাহাড়ি এলাকার দ্বিবর্ষজীবী আপেল আমি ফলিয়ে ফেলেছি। বেশি না, একটু বিশ্বাস, একটু ভালোবাসা, একটু আদর দিলেই হলো। গাছ ওসব বোঝে। গাছেদের ভালোবাস, গাছ রিটার্ন দেবেই। তবে উদ্ভিদের গণ-গোত্র প্রজাতি কুলুজি এসব জানা চাই। বুঝেছিস?'

ঘরের কোণ থেকে একটা জগ আর দুটো কাচের গ্লাস নিয়ে এলো। বলল, 'এতদিন তো দেদার মহুয়া খেয়েছিস, আজ নিমুয়া খা। আমার বানানো।'

'ছ্যা, নিমের মদ! তালে-তো তেঁতো হবে।'

'একদম না। চেখেই দ্যাখ না।' গ্লাস এগিয়ে দিল।

তাইতো! জিবে ঠেকাতেই তাজ্জব মেরে গেলুম। 'সত্যি বলছিস, নিমের মদ?'

‘মাইরি।’ তারপর বলল, ‘বাইরে চ। আরও কথা হবে বাগানে বসে।’

গ্লাস আর জগ হাতে বাইরে এসে দাঁড়াই দুই বন্ধু। বাইরেটা এখন আরও কালো, শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া আজিকে। অল্প চাঁদ গোচরীভূত। লাজুক মেঘেরা আলোর স্বল্পবাস পরে অবিকল নেমে আসছে মেয়েদের ঊর্মি-চালে। তাদের চুলসমূহেও প্রিজমের লোহিত ঢেউ। ক্রমে বাঁ থেকে ডা-নে ভেসে যাচ্ছে মেয়েরা। দূর-দূরান্ত অব্দি কোথাও কোনো ঘরবাড়ি নেই, চাদ্ধারে আলো-আঁধারের উল্কি মেখে সরু উদোম গাছেরা স্রেফ সটান দাঁড়িয়ে। মৃদু ঝিকিমিকি, জুনিপোকার। রডোডেনড্রন উইলো গাছেদের খোঁপায় জোনাকির মচ্ছব। হাতে গ্লাস না থাকলে হয়তো গা ছমছম করত, এমন ভয়-ধরানো পরিবেশে কমল একা-একা মাটি কোপায়!

‘দ্যাখ,’— কমল আমার ভেতরের দ্বন্দ্ব খেয়াল পেয়েছে, বলল, ‘মাটিকে, প্রকৃতিকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মাটি থেকেই মানুষ পয়দা পেয়েছে, মাটিতেই তাকে মিশে যেতে হবে। আমরা যে ইটের ঘরবাড়ি, শহরের অফিস-কাছারি হাট-বাজার কালালি পেয়ে মাটির কাছ থেকে দূরে সরে যাই, তাই থেকে আমাদের গাছ-জঙ্গলকে ভয়। মানুষকে ঈশ্বর পেতে হলে, জীবনের অর্থ, শান্তি পেতে হলে মাটির কাছেই ফিরে আসতে হবে।’ ...

‘লে হালুয়া! গল্প লিখতে লিখতে তুই আবার কবিতাও শুরু করে দিলি নাকি?’

‘কবিতা!’ ও মোলায়েম হাসলো,— ‘কবিতা আসলে কী, বলতো? কবিতা করে মানুষ কী পেতে চায় সেইটা আগে বোঝার। কবি বলেছে যাকে, সে তো ঈশ্বর নয়। তবে ঈশ্বরের মতোই তার নিজস্ব কিছু রঙ, তুলি, নিজস্ব পোঁচড়। মানে, ঈশ্বর প্রকৃতিকে যেভাবে এঁকেছে, ওভাবে নয়, সামান্য একটু হেলে, খানিক অন্যরকম, খানিকটা নতুন করে আঁকা। সেই সাজবতী প্রকৃতি নাচুক, বাজুক, গাউক— এই তো কবি চায়। আমি চাই এমন কবিতা ভেতরের সবক’টা অক্ষর ফুটিয়ে, ভেতরের সবটা। আমার ভেতরের পল্লবিত গাছপালা কবিতা হয়ে বেঁচে থাক। আর কী পেতে চায় কবি, বল! আর কোন আমোদ?’

বললুম, ‘দ্যাখ, তোর কবিতাকে রিকগনাইজ করতে না পারলেও, তোর এই হাইব্রিড বাগান, এ সত্যি লাজবাব। ছ-ফুট লম্বা, আট কেজির পালং ঝাড়। ভাবা যায়! ফরেনাররা জানতে-পেলে তো শালা লুফে নেবে!’

‘তাই তো হচ্ছে।’ কমল ফুর্তি বাগিয়ে বলল, ‘এই যে পালং ঝাড়টা দেখছিস, কত মেহনতের ফল জানিস? প্রথমে মনে হয়েছিল বিদেশি স্পাইলাক আর বেটা আলাদা স্পেসিসের হলেও এদের গণ সমজাতীয়। পরীক্ষা করে দেখি, না, ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে না। গাছ অল্প খাড়া হয়েই নেতিয়ে পড়ে। শেষে ক্রোমোজম টেস্ট করাতে গেলুম কলকাতা, সায়ান্স কলেজের ল্যাবরেটারিতে। ওখানকার বিজ্ঞানীরা তো রেজাল্ট দেখে থ। দেখা গেল হাইব্রিড হয়েছে। ফিরে এসে চারা পুঁতলুম। ব্যাস, একটু সার-জল দিতেই গাছ একদম টনটন করে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু, তবু আমি ভেতরে স্বস্তি পেলুম না। যেটা চাচ্ছিলুম হচ্ছিল না। একদিন কী মনে হলো, আনমনে পাতা ছিঁড়ে মুখে দিয়েছি, দেখি অদ্ভুত সরবতের স্বাদ। টেস্ট করলুম, সত্যি তাই। দুটো পাতায় একগ্লাস সরবত। চিবিয়েও খাওয়া যায়, শসার মতো। তরকারিও করা যায়, ঐ মুলো যেভাবে রাঁধে আরে-কি।’

চমৎকার! আমি তো আশ্চর্য জানাবার শব্দই পাচ্ছি না। কমল বলল, ‘গত তিন মাস ধরে আমার পালং বিদেশে পাচার করার ষড়যন্ত্র চলছে। এতে রিবোফ্লোবিন, ক্যারোটিন, আয়রন, ভিটামিন-সি আর বি, ফরফরাস, ক্যালসিয়াম সব আছে কিনা। আমি কিন্তু এখানকার প্যাংলা বাঙালিগুলোকেই খাওয়াতে চাই। কিছুই খেতে পায় না বেচারিগুনো, আমার পালং খেয়েই একটু মোটা-তাগড়া হোক। ফলে রোজ সকালবেলা হীরাপুর হাটে দশ-বিশ সের মাল সাপ্লাই যাচ্ছে। কিছু পয়সাও পাচ্ছি। ভাবছি দুটো জার্সি গাই কিনবো। এখানে খাঁটি ঘিয়ের বড় অভাব। ছাগলের দুধে আম মিশিয়ে জ্যাম-জেলি বানাবার কথাও ভাবছি। দেখা যাক।’

অবশ্য, লেখক কমল চক্রবর্তী বাংলা বাজারের রিকগনিশান না পাক, ও যে সরাসরি অমর হয়ে যেতে পারে, একদিন, হুট করে, এমনটা ভাবা যায়। বিচিত্র-সব ভাব আর ভাবনা কমলের। তার নমুনা তো শুধু ওই হাইব্রিড বাগান নয়। এমনি আরও কত বিচিত্রতর ভাবনার ঝাঁঝিতে পা ফিসলে ভেসে যায়, মাঝেমধ্যেই। তখন কিছুকাল আর দেখা মেলে না, তারপর চেহারা ভুলে যাওয়ার প্রাক-মুহূর্তে ভেসেও ওঠে ভুস করে। তখন ফের চ্যাঙারি-ভর্তি গল্প, মাথায়। কমল তাদের এক-এক করে ছাড়ে।

বড় জবরজং আর বিদঘুটে সেসব গল্প। একদিন সে নোনাধরা মানুষের কাহিনী শোনায়। হাত পা গা গলে গলে পড়ছে। শেষে কঙ্কাল। বলে, 'এই তো মানুষ। খাচ্ছে, হাগছে, আর মোট বইছে, ঘুমোচ্ছে। আজ আর কোথাও একফোঁটা মানুষ নেই রে ভাই। মানুষ লোপাট। মানুষের গোটা মাংসাটাই। গোরপাড়ায় পিদিম জলছে শুধু, ধিকিধিকি মিকিমিকি। আচ্ছা, তোরা কি কেউ বেঁচে আছিস? একজনও? মানুষে মানুষে আজ যে দ্বন্দ্ব, বিচ্ছিন্নতা, তাতে মানুষ টুকরো-বেটুকরো হতে হতে পুরো মানুষটাই গায়েব। সবখানে ক্রিমেটোরিয়াম সাজানো। দে, আরেক ঢেলা মানুষ দে, খাবো।'

কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রচণ্ড মানুষপ্রিয় ছিল কমল। আমরা দেখেছি মানুষ দেখলেই ওর মিশতে ইচ্ছে করত। মিশে যেত। আর যায় না। এখন মানুষে বেজায় অরুচি। বলে, 'মানুষ দেখলেই ঘেন্না। ঘেন্না আর ভয়। জানিস, মানুষের দুটো হাত, পাঁচটা করে আঙুল। তাদের জটিল কাজ-কারবার। তদুপরি, মানুষের ব্রেন আছে। আস্ত একটা ঘালাইঘর। তাতে হাজার ষড়যন্ত্রের অবিরল কিউপোলা। মানুষকে বাঁ হাতে টোস্ট আর ডান হাতে বিষ্ঠা তুলে খেতে দেখেছি আমি। ওসব না খেলে মানুষ বাঁচতে পারে না। দম ফুরিয়ে হাঁপ ওঠে, খকখক কাশি, গা-গোলানি, কাঠনেকার, চোঁয়াঢেকুর, হিক্কা,— তবু খাওয়া মানুষ থামাতে পারে না। কেননা, খাদের সুউচ্চ হাঁ থেকে ওই অন্ধতমিস্রা দেখতে মানুষের হামেহাল ভয়।' ...

এই প্রেক্ষিতে কমল যে নির্জনতা চাইবে, সে তো রফা হয়েই আছে। কেননা, যে-যে জিনিসে মানুষের আসক্তি, সেই সেই জিনিশের প্রতি তার প্রবল বিবমিষা। যেমন, মানুষ ভালোবাসে গর্ভস্থ প্রাণ, ফিটাসের আঙুল চোষা, প্রাণচাঞ্চল্য। কমল ভালোবাসে হারাকিরি, পাল্টাখুন, জেনেসাইড, গিলোটিন উৎসব। তার প্রিয় শব্দ-চতুষ্টয় : মুর্দফরাস, চোরাহামলা, জহরব্রত, গণধর্ষণ।

এবং, সেই নির্জনতা খুঁজতে, সে, আগাপাস্তলা নেমে পড়ে রাই-সরষের হরিৎ মউজে। তারপর আর থই পায় না। কোথাও কিছু নেই, চাদ্ধারে সবুজ বনরেখা, শুধু। নামহীন বুনো প্রান্তর। এবং রিক্ত। ফিরোজা রঙের বিকেল। লাজুলি আকাশ। পাখপাখালির এরিয়াল পাকসাট। এগিয়ে চলে। উদ্দেশ্যহীন। ক্রমে ক্রমে নদীর পাড়। শীর্ণ জল উল। কঠিন শিলার চাটান হয়ে ক্রমশ গভীর খাতের দিকে। দু-পাড়ে বালি, ধূ ধূ। বালি ফুরিয়ে এবড়ো-খেবড়ো রুখু জমি। ধূসর গাছপাথর। শেষমেস পাহাড়ডেঙার মেঠো জঙ্গলেই কমল আবিষ্কার করল সেই অর্থিত ঐকান্ত।

পেল্লাই দালান। ঢাউস-ঢাউস থাম। বড়-বড় কাটরা। বালাখানা। আওয়াজি। সবই সেই পুরাতনী টাইপ। দেয়ালের ছই ঘেঁষে বেশুমার আগাছা। আর কাদার পলি, থকথকে। বহু বছর মানুষ ঢোকেনি এ-তল্লাটে, কেন-জানি, কমল বুঝে ফেলল। কুকুর? সম্ভবত তারাও পরিত্যাগ করেছে এই মৃতনগরী। কমলকে দেখে ডানা ঝাপটে পালিয়ে গেল একপাল দেহাতি বাদুড়। দেখল, সাপখোপের নিরুদ্বিগ্ন চলাফেরা। চিলছাদে পাখিদের স্মার্ট উড়ে এসে বসা, উড়ে যাওয়া। টিকটিকির অজস্র কাটা ল্যাজ। কিছু পরিত্যক্ত খোলস ও দাঁড়। অষ্টাপদ মর্কটের নিপুণ আল্পনা। ক্ষয়ানো দেয়ালে বারোক ফ্যান্টাসি। দেখে-টেখে, আহা, হঠাৎ খুব ভালো লেগে গেল কমলের। এই সেই নিভৃত কোণ, যেখানে অনায়াসেই কাটিয়ে দেয়া যায় বাকিটা জীবন। জীবনের বাকিটা। কমল ভাবল। ভাবাভাবি শেষে, রফা।

প্রহর যায়, দিন যায়। শেষে হপ্তা। কমল আর ফেরে না। ওর বাড়ির লোকজন কেঁদে কেঁদে টায়ার্ড। আমরাও ঘোর পরেশান। ভেবে কূল পাই না। পুরো একটা হপ্তা এমনি পেরিয়ে গেলে এদিক-ওদিক লোক পাঠাই। নিজে যাই শ্মশানপাড়া। চাঁড়াল বলল, না বাবু, তিনি তো আসেন্নি! কালুয়ার গাঁজার ঠেকে: নাহ,

গুরুর কোনো নিউজ নেই। নন্দরানীর ফ্লাটে, নন্দ বলল, 'মিনসে সেই যে গেল, এত করে বন্নু, এলো নি তো!' সম্ভাব্য প্রতিটি জায়গায় খোঁজ নিয়ে বাকি লোকেরাও ফিরে এসে জানাল, না কোনো খবর নেই।

তাজ্জব তো! গেল কোথায় লোকটা?

আট দিনের দিন, বেলা এগারোটা নাগাদ আমাদের ছ'শরিকের থানায় যাবার তোড় হচ্ছে, এমন সময় বসাকের ছোটো ছেলে ভোঁদড় ঘুড়ি আর নাটাই হাতে তরতর করে নেমে এলো ছাদ থেকে,— 'বাবা, দ্যাখো-দ্যাখো, কমল জেঠু আসছে।'

সক্কলে হুড়মুড় পায়ে ছাদে।

একী! এ কী হলো রে!... দিগন্ত থেকে দিগন্ত উদ্ভাসিত সবুজ ঢেউ, ওপরে ডিম্ব-স্বচ্ছ আকাশ, একটা সোয়া ফুট মতো টিনের চিমটে আর কমণ্ডলু হাতে, প্রস্রাব-স্থান-মাত্রটিতে কোপনি আঁটা, সর্বাঙ্গে ছাই, জটে-ভরা মাথা, আউলিয়া দাড়ি,— অনতি লংশটে দেখে যা ঠাহর হলো, হেঁটে আসছে একটা খ্যাপা-মতন সাধুবাবা।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই, খড়ম দেখিয়ে বলল, 'আমাকে পেন্নাম কর। আমি শ্রীশ্রী ৫০১ বাবা কমল চক্কোত্তি—'

পরে সেই গল্প রিলিজ করল শনিবারের চাতালে :

'... দেখি, অজস্র প্রাণী। কিন্তু কেউ শব্দ করে না। প্রথম যেটা, আমি আমাকে ওদের মতো হবার মহড়া দিলুম। মানে, শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া অন্য কোনো শব্দ প্রহিবিটেড। হাঁচি কাশি হাইতোলা থুতুর থুঃ, এসব মওকা বুঝে। আমার নাকসাট নেই, সেইটে বাঁচোয়া। উঘারী তো হয়েই ছিলুম, সেইমতো মুভমেন্ট। মানে, পারতপক্ষে দু'পায়ে হাঁটা। প্রধানত চার পায়ে। মাঝেমধ্যে বুকে ভর দিয়ে। পেট তো ব্যাটা হেবি খোঁড়ল, থেকে-থেকে হাঁ। খাবারের রেসিপি সিমালটেনাসলি শুধরে নিই। যেমন, ব্রেকফাস্টে টিকটিকির ডিম। সেদ্ধ কিংবা পোচ। লাইটার সঙ্গে থাকায়, হেল্প। কাঁকলাসের তেল ছেঁকে চন্দ্রবোড়ার ডালনা। ক্বচিৎ বাদুড় জুটতো। কাঁচা চিবিয়ে খেতে খাসা। সঙ্গে তেঁতুলবিছের চাটনি।'

'য্যাঃ!'

'অই তো।....' কমল বলল, 'জানতুম, বললে তোদের বিশ্বাস যাবে না, তাই স্যাম্পেল নিয়ে এসেছি। এই দ্যাখ—' বলে, বুকপকেট থেকে একটা ছোট্ট হোমিওপ্যাথির শিসি বের করে দ্যাখায়,— 'কী, বলতো!'

আমরা চেনবার চেষ্টা করি। পারি না।

কমল ছিপি খুলে ঢক করে মেরে ফেলল পুরোটা। 'আঃ!'

'কী খেলি বে?'

'গোবরিয়া বিছের পায়খানা।'

'ওয়্যাক!'

'বললুম না'— সাপের মতো হাসতে হাসতে কমল বলল, 'চাইলে মানুষ পারে না, এমন কী? দেখি যে, মাংসগুলো কেমন সড়সড় কাঠ মেরে যাচ্ছে। হাড় ফাঁপা আর বাতাসে বোঝাই। না, লেজ গজায়নি। তবে খুলির দু'পাশে দুটো চামড়ার ঝুঁটি। হাতের থার্ড ফিংগারগুলো আচম্বিতে লম্বা হয়ে এক-একটা ডানা হয়ে গেল।'

'ফ্লাইং মেমব্রেইন!'

'একজ্যাক্টলি।'

'পারলি, উড়তে?'

'না রে।' কমল দুঃখ-গলায় বলল, 'পারলে তো সবার আগে তোদের ঠেকেই এসে বসতুম। পারিনি। টাইম পেলুম কোথায়, বল। ওড়বার জন্যে যে স্টেরনাম লাগে, সেটা গজাতে অন্তত দেড় মাস। দিলুম? তবে, দুটো ব্যাপার আমার কাছে ছিল চূড়ান্ত' — কমল আরও জুড়ল— 'এক, সরীসৃপের আদর না পেলে রাতে

ঘুম আসতো না। দুই, মানুষের চেহারা মনে এলে, দেখেছি, আঙুলগুলো বেজায় শক্ত। দিনের বেলায় ঘুমপাড়ানি গান গাইতে আসত আসাপাব্যাঙের দিদু, সঙ্গে তেলের বাটি। উল্লুক দেখিনি, বেবুন দু-চারটে। তবে পাখি দেদার। পাখিরা সব বড় বড়। যেমন চিল। কাকালদের সঙ্গে খাস ইয়ারি। একদিন প্যাঁচার ঘুৎকার শুনি, টানা। শ্যেন বা শশাদের প্রতি স্পেসিফিক টান, ফীল করি। ঝোটনও দেখিনি। শকুনির কচি বাচ্চারা একদিন লুডো খেলতে এলো। ওরা বলল, পেঙ্গুইন চাচাকে ডেকে দেব, চেস খেলো। ফোঁস না শুনলে হাগা নামতো না। সাপের নাম নষ্টনাগ। তলায় ঘুমুতুম। একদিন স্বপ্নে দেখি দু-মুখো সাপেদের আমাকে নিয়ে টাগ অব ওয়ার।'

'তুই কে রে? মানুষ, না পিশাচ?'

'না, মানুষ না। হতে পারিনি।' কমল বলল, 'হতে আর পারলুম নাকি! আমাকে পেয়ে কায়াশূন্য অশরীরীদের সে কী উল্লাস! একদিন সেমেটারির ধারে গেছি, পাশে শ্মশান। চাদ্দিক শুনশান, ফাঁকা। টাগ অব সাইলেন্স। হঠাৎ একপাল কালো ছায়া ঘিরে ধরল চাদ্দার থেকে। কউন হ্যায় রে সরওয়া, হেনে আও।'

'ডাকলো তোকে! ঐ বাবাজিরাও মামদোগুলো?'

'মা শ্মশানকালীর দিব্যি।'— গলার বিচিতে চিমটি কেটে কমল বলল, 'ভাবলুম, সবেরই একটা সিস্টেম আছে। গেল বছর দেখলি না, নদীর সব জল পাতালে সেঁধালো। ফলে খরা। খরা এলেই আকাল, আকাল আনে মারী, মারী মানে মরণ। ফলে এলাকা বিশেষে ভূত-প্রেত-পিশাচের বিক্তাপ বেড়ে যেতেই পারে। কিন্তু ভূত হলে কী হয়, এদের কেতাকানুন টেরেসট্রিয়াল জীবদের-চে ডিফারেন্ট কিছু নয়। আমিও জোর গলায় জবাব দিলুম: 'আঁমি কঁমল চঁক্কোত্তি। ত্রিঁপাতকের রাঁজা। পাঁপচুঁড়ামনি। পঁথ ছাঁড়।'

'শুনে, শিবানুচরেরা কী বললে?'

'বলেনি কিছুই। ভাবলে, এমন রোবদার নাম, আর গলায় এমন রোয়াব। এ তারা ভুল মানুষকে পাকড়েছে। মুহূর্তে পা-কয়েক হড়কে শান্ট মেরে গেল। একটা লাথখোর মামদো ওদেরই মধ্যে থেকে গুড়ুম করে ডিগবাজি খেয়ে কড়াৎ করে শেকড়সুদ্দু গোটা নঙ্কুটাই উপড়ে নিল আমার।'

'হাই লা!' মদনা বিষম খায় আরেকটু হলে, 'তুই কী করলি?'

'আমি আরও ভয়ংকর প্রাণী। সাত শয়তানের আশির্বাদপুষ্ট। তাও খেয়ে গেলুম। রাতে ওখানেই সত্যাগ্রহে বসে পড়লুম। নষ্টনাগের লীলা। বললুম, মুতের নলীটা ফেরত দে, নইলে উঠছি নে।'

'দিল?'

'বিলিভ মি। আমার সঙ্গে প্রেতেদের দোস্তি হয়ে গেল। বিশেষ করে ডিক্রুজ আন্টির। সেই-যে, গোবরে গড়া গাবদা-গাবদা কালোকুলো ধুমসো ফাজিল, ষাঁড়ের মতো মাই দুটো। মনে পড়ছে? সেই মাগীটা। দেখলুম, প্রেতলোকে এসেও রঙ্গ ভোলেনি। কোলের ওপর বসিয়ে দু'কান খামচে আদর। বলল, দুধ-আম খায়েগা? আম আমার না-পছন্দ, তোরা জানিস। তবে, দুধের পোকা। ঘাড় এলিয়ে বলি, খাবো। লে— খাঃ, বলে আন্টি ব্লাউজের হুক খুলে ইয়াববড় একটা মাই-ই ভরতে গেল পুরো। আমি খাই না, শুধু চুষি। আন্টি বলে, বাঃ, ভোত আচ্ছা। আঁড়ে হাত বোলায়। বলে, হম তুমকু রোজ দেখতি। তুমকু নেই মালুম, মেরে-কু তুম ভোত অচ্ছে লগতে। তুমকু লগতা কি মেরি উমর জাস্তি। নই ক্যা? পর হম সচ্চি বোলতি। মেরি উমর জাস্তি নই। তব্বেত থোড়া বিগড় গয়া, বস, মর গই। লেঃ, অওর লে। আন্টি আঠা লাগিয়ে আমার নঙ্কুটা দোবরা ফিট করে দেয়। তারপর নাড়ানাড়ি শুরু। আমি কারেন্ট খাই। বিরক্ত হই। গরগর করি। শেষে, রেগেমেগে আচ্ছাসে ফন্ডলিং। আন্টির ওহ মাই গড বলে সে কী খিলখিল হাসি!'

উপাংশুবাস থেকে ফিরে এসে, আমি খেয়াল করলুম, কমলকে বেশ ফুরফুরে লাগছে। মুখে শম আর শান্তি।... আশ্চর্য! মানুষ এতো তাড়াতাড়ি, এতো সহজে ভুলে যায়! যেতে পারে? সব! কমল কি সব ভুলে গেল এই সাত দিনে? গেছে কি? সত্যিই!

ফকনা তুই একবার ঠেকাবি,

তারপর আমি। গুল্টো সব্বার লাস্টে

সত্যিই কি কমল সব বলেছে? স-অব বলার মতো কলেজা তার আছে? কমলের অন্তত একটি পাপের কথা আমি জানি, যা বললে শাস্ত্রোল্লিখিত ঐ উনষাট পাপকর্মই পানসে হয়ে যায়। যে-কথা সে কাউকে বলেনি। বলবে না, জানি। বলা যায় না। কেননা, এ পাপ এমনই, যা নিয়ে আগে কেউ, কোনো, বই লেখেনি। অন্য কেউ লিখে রাখলে কমল গোটা সংবৃক্তিটার একটা প্রেক্ষিত অন্তত পেতো। অথচ, সর্বাগ্রে সে লিখবে, এ হয় না। ফলত তার ঐ পরাদর্শি চেতনা, ঐ বিশ্বাস, ঐ মতবাদ একটা স্টেজ অব্দি উঠে আসতে পারে মাত্র,— মুদ্রারাক্ষসীর জরায়ুচ্যুত হবার ক্ষমতা তার নেই। কমল-দর্শন এখানেই কর্তিত। অন্তত, আমি যেভাবে বুঝি, আসলে, চেতনার ফ্লোর ঝেঁটালেই কিন্তু প্রাকচেতন জৈববৃক্তির কালিঝুলি মনের কন্দর থেকে ঝেঁটিয়ে ফেলা যায় না। মনের ফাঁকফুঁক দিয়ে কমলেরও সযত্ন-নিরুদ্ধ প্রাকচেতনিক সত্তা এমনিতরো অপ্রস্তুত উঁকি মেরে থাকলে কী আর করা! ওরে, ও ভাই, কে আছিস, আমাকে মুক্ত কর! মুক্তি দে আমায়— বলে সে চেল্লাতে পারেনি, সে-উল্লেখ অবান্তর। চেঁচিয়ে বলেছে অনেক কিছুই, কিন্তু এই একটি পাপের কথায় সে এদান্তি মূক হয়ে আছে বললে খুব অসত্য বলা হয় না। বস্তুত, মনের নেংটিটা সর্বক্ষণ আঁটা। সব বস্ত্র মুক্ত, স-অব, কেবল ঐ গোপনতম অংশটুকু বাদে। তার দশমিক অংশও, না, খোলেনি। তার মাখনশুভ্র পরাদর্শি স্বচ্ছতার ওপর কজ্জলির ঐ ফোঁটা নিছক ধাব্বা নয়, প্রতীকী সৌন্দর্য যেন।

গোড়া থেকেই শুরু করি তালে।

কমলের একটা ব্যাপার, নিরানন্দ হবে জ্ঞান করে আগে বলিনি,— কমল মাঝেমধ্যে হঠাৎ-বেহঠাৎ নাঙ্গা হয়ে যেত। যাকে বলে উদোম বা দিগম্বর, আক্ষরিক অর্থে। তখন কী সে করছে, কার সামনে, খেয়াল কিছুই থাকত না। অবশ্য, করতো-টরতো কিছুই না। শুধু বলতো।

বলতো, 'আমি কে, বলতো! চিনতে পারিস?'

আমরা ফ্যালফ্যাল। অবোধ শিশু।

'চিনতে চেষ্টা কর। গেস কর। দেখেছিস কোথাও, কখনো? চেষ্টা করলেই দেখবি চেনা কিছু মুশকিল নয়। কেননা, আমার ধারণা, যার সঙ্গে তোদের প্রত্যেকের প্রতিমুহূর্তের উঠবোস, যে তোদেরকে রেখেছে হরদম জাগিয়ে, উদ্যত অহংকারী, সদাই উৎফুল্ল ঝরঝরে, নিঃসংকোচ নির্লজ্জ, ঘোড়েল কুটিল শঠ পট্টিবাজ, ছলী ভক্তবিটেল ডিগর প্যাঁচালো ধাউড় বাস্তুঘুঘু নাবাড় মিরজাফর, সামান্য উদাসীন, মওকা বুঝে খ্যাপা বা খেয়ালি— প্রচ্ছন্নভাবে এইসব নানান ভিনমেজাজি চরিত্র আলগোছে ঢুকে আর মিশে রয়েছে যার মধ্যে। আমি সে-ই।'

কেউ হয়তো দাঁত-কপচে ফুট কাটলো — 'তুই কে রে, অ্যাড়া! মানুষ না?'

'না, মানুষ না।' পূর্ণশতাংশ প্রত্যয়ী গলায় সে বলে, 'কোনো পুরুষই মানুষ না। হতে পারে না। আজও যে তোদের সামনে উদোম দাঁড়িয়ে, পনেরো টাকার গাণ্ডুর মতো, — মানুষ না। বিশ্বাস কর, আমার লি। আছে। মূর্তিধারী যৌন-প্রতাপ। একরাশ দাঁত তার। রক্ত ঘোলাটে, আর তুখোড় উত্তাপ দেহে। মাসল আছে। ভয়ানক দেড়েল। দু'খানা গান-পাউডারের ধুকড়ি কোমরে গোঁজা। মুখ তার হরদম হাঁ। লকলক। ভয়ংকর প্রতাপ তার। প্রচণ্ড সংঘশক্তি। আমি সেই মহাপরাক্রমশালী অমিতবীর্য তেজিষ্ঠ যৌন-অহংকারী লিঙ্গ সম্রাটের বশংবদ হুকুমবরদার মাত্র। হাঃ হাঃ হাঃ —'

শেষ শব্দটার পর সে বরাবর অট্টহাস জুড়ত। জুড়তে সে ভুলতো না। ভোলেনি কখনো। আর, আচম্বিতে হাসি রুখে, প্যান্ট তুলে নিত। ফের, কোথাকার-কে মুখ করে ঘ্যাঁচ করে কেটে পড়ত। আমাদের সকলের মনে পড়ে যেত অলিভার টুইস্টের সেই চরিত্রটা। গুরুতর ডায়লগ বলতে বলতে যে হঠাৎ-ই অদ্ভুত মূক মেরে যেত। কুট করে ডিবে খুলত। নস্যি নিত। তারপর সংলাপের বাকি অংশটা অমনি থুয়ে, টুক করে গায়েব। ... তবে হ্যাঁ, যতক্ষণ বক্তৃতা চলত, দেখেছি, হুকুমবরদারের হুকুমদারটি গড়ন ও বর্ণচ্ছ্ টার দিক থেকে সেই প্রাক-ইতিহাস যুগের অতি খর্বকায় ও কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রবটু বা নেগ্রিটো সর্দারই, একটি।

এরপর আসল গল্প শুরু।

কমল একটা মেয়ের তল্লাশে ছিল। বলল, 'দে না একটা খুঁজে। তোদের সবার আছে। আমার নেই। পায়ে পড়ি, টুঁড়ে দে। স্রেফ একটা নিপাট মেয়ে। অন্তত যার ধড় আছে। মুণ্ডু না হলেও চলবে। যার বুকে কান পাতলে পুরীর গর্জন। দু-সের বাড়তি লোচক যার। যাকে কুতিয়ে মজা। যে আমার বাঁধা হয়ে থাকবে, কিংবা আমি যার। চাইছি, বুঝতেই পারছিস, আমার এই ধনেশটার জন্যে। বাছা এত কস্তাকস্তি করছে, এতো ধকল। এ বেচারির সই নেই, খেলার। এরি জন্যে। দে না, খুঁজে!'

বউ সম্পর্কে কমলের অ্যাম্বিশান ছিল তার বদনখানি হবে নিমকদার। এ আর এমন কী! সবাই চায়। কমলের এক্সপেক্টেশানটা ছিল খানিক হেলে। হালকা গোঁফ থাকবে। নোলক পরবে। ঝিকমিক ঝিকমিক। যার ঠোঁট মনে পড়লে মাথায় চড়ে যাবে থ্যাঁতা রসুনের গন্ধ। যাকে চুমু খেলে সারাটা রাত টকে থাকবে মাড়ি। চোখে ননস্টপ স্ফটিক। আইরিশ গমের পালিশ, গালে। গলা হাস্কি। হাসলে দাঁতের শাদা। সবচে বড় যেটা, কাঁখতল হবে র‍্যাঁদামারা। আলবাৎ করোগেটেড। এরবাদে যাই হোক, কিন্তু কাঁখতলীটা মাস্ট। এমনিতে জিনস। তবে শাড়ি পরলে শ্রোণী যেন থাকে ফেঁপে। ভাপানো বুক। বানর্টসিনা বোঁটা। বোম্বাই নলকিনী। মুঠো-খানেক মুজঘাস। কিংবা মধুকুপি। পাকাপোনার পেটির সদৃশ সিংহদ্বার। পাল্লা সরালে সদ্য পেড়ে-আনা ভূতকেশী ফুলের পারফিউম। এসব অন্তত।

জোর তল্লাশি।

ঘুম ভাঙার পর বসাক মদনা ভচি বিল্লু নুনা আর আমার একটাই কাজ মাথায় থাকে,— গুরুর গঙ্গাজল তালাশ। আর, সারাদিন যে-যার মতো করে খুঁজে সাঁঝের ঠেকে রিপোর্ট।

'কি রে, তোরা যে সব মুখ লটকে! কিছু হলো?'

'বললুম, 'লেগে আছি। হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।'

বসাক বলল, 'একটা ডাকপিওনের ডিভোর্সি জুটেছে। ওর একটাই টেনডেন্সি, পুরুষ খেদানো। মাংস ছোঁয় না। ছুঁতেও দেয় না। বেলনা নিয়ে শোয়। করবি তো বল, কথা চালাই।'

'ভচি-নুনা-বিল্লু। তোদের কিছু?'

ওরা তিন মাসকেটিয়ার্স, একসঙ্গে বলল, 'না রে, হলো না। একটা জুটেছিল। ও তুই নিতে পারবি না। সংস্কৃত পড়ে। সংস্কৃত লেখে। ওই ভাষাতেই নাকি কথা-টথা। তার বাদে পিওর ভেজ, গলায় রুদ্রাক্ষ। জপ-তপে আড়াই ঘণ্টা। মাঝরাতে উঠে মা কালী। খড়গ রেখেছে। জীবে মায়া কম। তোর জন্যে ফিট না। তাই নাকচ করে দিলুম।'

'বেশ করেছিস। আর মদনা?'

মদনার আবার মিক্টিউরিশনের বাতিক, ক্ষণে-ক্ষণে হিসি যাওনের। 'দাঁড়া বলছি,' বলে কুকুরের মতো ঠ্যাং তুলে এক ছটাক চিরিক-স্প্রে সেরে এসে বলল, 'না বে। অনেক বোঝালুম। বেটি কিছুতেই মানলো না। বলে কিনা, লেখক-টেখক হলে নাকি নানা প্যাটার্নের বাওরামি থাকে। তারবাদে বাঙালি লেখক। মানে, পিত্তশূল অম্লশূল বদহজম আসলার অর্শ সিফিলিস ব্রঙ্কাইটিস হিস্টিরিয়া এসব নানান খেপের এগারো উপসর্গ। সে মাল বেটির চলবে না।'

বাঙালি চরিত্র মাত্রই একধরনের ভেঙে-পড়া বিলাসিতায় ভোগে। কমলও ভেঙে পড়ল। মন বেজায় টেসে গেল ওর। সব ছেড়েছুড়ে দিল। গ্যাঁজানো। আড্ডা মারা। গল্প। গুল। দাড়ি বাড়তে লাগল। লুঙ্গি পরা শুরু। ছেঁড়া গেঞ্জি। বললুম, 'আর কেন, এবার একটা নামাজি টুপি কেন একটা। আর জায়নামাজ মাদুর। তারপর রহমতের চিরাগে হাত ঘষে মাইকের চোঙা নিয়ে চেল্লা— আললাাাাাাাাাাাাাাাহুউউউ... আক... বঅর ...'

কমলকে দেখি, আইব্বাশ, 'আশহাদো আললা ইলাহি ইল্লানাহ আশহাদো আল্লা মোহাম্মাদার রসুলুল্লাহ' অব্দি গড়গড় করে বলে গেল। তারপর মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ চশমার ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে চোখের তড় মুছে : 'জানি, তোরা কেউ আমার খারাপ চাস না। তোদের আর কী দোষ? এ আমার পাপের ফল। একটা মেয়ে জুটল না। ধনেশটাকে এমনি এমনি শুকিয়ে মরে যেতে দেখব চোখের সামনে। এ আমার পাপের ফল ছাড়া আর কী, বল?'

বললুম, 'অ্যাড়া, তুই আমার লেঙোটিয়া ইয়ার। তোর দুঃখ বুঝি। কাঁদিস নে রে ভাই। চোখ তুলে একবারটি চা। দ্যাখ, কে দাঁড়িয়ে তোর সামনে। ভালো করে চেয়ে দ্যাখ' —

কমল চাইল।

ও-হো। চাদ্দিক তখন ধুলোয় ধুলোময়, বিষ্টি-টিষ্টি হবার আগে যেমন, ঠান্ডা-ঠান্ডা ভাব— দেবী আগমনের সময় যেরম হয় আর-কি, ... তবু, তার কনীনিকামণ্ডলের যা রেঞ্জ, অনতি লংশটে রিনেল ব্যাগ আর থ্রি-ফোল্ড ছাতি মাথায়, মিষ্টি জিনস আর গুরু পাঞ্জাবিতে আউটলাইন এতো বিকচ, যে, কমল ভাবতে পারল, ঝড় পেরিয়ে, ফুটপাথ ধরে, আর কেউ না, তার রানীই চলে আসছে, ধেয়ে।

উফ, কী রিদম রে বাপ! উঠছে নামছে। নামছে উঠছে। জ্যান্ত ফাইভ বেলসের খলবলে বিজ্ঞাপনই যেন, একটা। তেমনি, অবিকল কমলের খোয়াবে দেখা ঠমক। গালে লালসীক, হুবহু ঐরকম। তর্জনী আর বুড়ো একযোগে নিসপিস করে। ... তো, ওই দেখে, কমলের জিব কুকুরের মাফিক এক হাত লম্বা হয়ে ঝুলে পড়বে না তো কি বড়ু চণ্ডীদাসের পড়বে? চড়াৎ করে লাফিয়ে উঠে বলল, 'হাইগুরু, এ যে আমার সপনো কী রানী গো!'

বসাককে বললুম, 'তুমি তো চাঙ্কি শেঠের খাস আদমি। ম্যানেজ করো।'

বসাক খচে লাল, 'ইয়ার্কি মারাচ্ছো! জানো, উটি কে?'

জিব কেটে বলি, 'জানি। কুরুবিন্দ উকিলের ভাতিজি। হাই সোসাইটি ফের্তা।'

'তবে?'

কমল আর থাকতে না-পেরে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে, — 'দোষ নিয়েন না হোজুর। রানীকে রাজরানী করে রাখবো। পারলে, মহারানী। চাও কি, ছোঁবো না পর্যন্ত। খোজা ব'নে যাবো। পাঁচো ওয়াক্ত নামাজ। কিন্তু একবারটি ভেঁটিয়ে দাও প্রভু। পায়ে পড়ি, চন্নামৃত ধুয়ে খাই তোর। শালা!'

বলতে বলতে একরকম শুয়েই পড়ল কমল। আর ওঠে না। নড়েও না। ফিট হয়ে গেল নাকি রে! অনেকক্ষণ ওয়েট করলুম। শেষে প্র্যাকটিকাল জোক। পেছন থেকে পিঠে আইসা-একটা ঘুঁষো : 'শাল্লাহ, পেরেম করা হচ্চে। অ্যাঁ, পেরেম করা হচ্চে!' ... কমল আচমকা খেঁকিয়ে উঠতে গিয়ে, কঁকিয়ে— 'উঃ, কী হচ্ছে? লাগে না বুঝি!'

কমলের এসব ছিল না। তবে কি প্রেমেই পড়ে গেল রে বেইমান! হরি হরি।

ফি অভাবী পাড়ায় একজন করে পরেশ। ওরা মামুলি নাটাইয়ের এওয়াজে নরেন ডাক্তারের খবর এনে দেয় বিজয়া মাঠানকে। এক্ষেত্রে বিজয়া, আমরা, এই সাত হারামি, বোঝাই যাচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে তাক করলুম ঐ মাকড়াকে।— 'ইয়ে, বলছিলুম যে, রানীকে তো তুমি চেনো, থুড়ি, তোমার কে-যেন?'

'জেঠতুতো দিদি।'

'তুতো। যাক, নিজের নয় তালে। খ্যালে?'

'হ্যাঁ। দিদি কেরাম খেলে আমার সঙ্গে। আর, রুবিক কিউব।'

'না-না। গোল্লাছুট খেলে না? চু-কিৎকিৎ!'
'না। মা বলে, ওসব ছোটলোকের ছেলেরা খেলে।'
'তোমার বাবা বুঝি খুব বড়লোক?'
'ইয়াব্বড়ো। তোমার-চে এক হাত লম্বা।'
'বাঃ, তোমার বুদ্ধি দেখছি সোনার পাঁঠার মতো। ঘুড়ি ওড়ায়?'
'না। চোখ অন্ধ হয়ে যায়।'
'দিদি তালে খ্যালে কী?'
'চেস, চেকার, জ্যাভেলিন থ্রো।'
'অ্যাঁ! বলো কী! বর্শা ছোঁড়ে? কোথায়?'
'কেন, ঐ জুভেনাইল পার্কে। দিদি রোজ ওখানে পোলভোল্ট প্র্যাকটিস করে।'
'আর গ্রেকোরোমান! মালাম করে না?'
'না। সোর্ড খেলে। আমাদের সঙ্গে। আর ব্যালান্স বিম।' ...

কমল আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না। শুয়োরের গুয়ের মতো মুখ পেঁচিয়ে বলল, 'ভোঁদু। ভোঁদু তুই একটা। বোতল কোথাকার। উল্লুক। গাধা। একটা দেড়ফুটিয়া বুতরু, তারও তুই লেংগি খেলি। তোকে দিয়ে কিসসু হবে না। যা, গিয়ে দুদুভাতু খা।'

অ্যাঁ! অ্যাঁড়া ব্যাটা কয় কী? আমি শালা পাড়ার এক্স-লন্ঠাইবাজ, পাঁজরহারামি। থোবড়ায় দাগা। বুকে তক্তা বেঁধে হাতি চড়াতুম। তারবাদে গলায় রুমাল, জামার কলার সরিয়ে ফুঁ আর ঠোঁটে মাওয়ালি শিস, — এসব ধরলে, এখনো, কিছু না হোক, বত্রিশের খোকাবাবু ভেঙে বাইশের ছোটা চেতন ব'নে যেতে কতক্ষণ? তাকে কিনা এই অপবাদ! এহেন চ্যালেঞ্জ?

তাও-খেয়ে সেই বিকেলেই জুভেনাইল পার্ক—

কলের ডগায় বাচ্চাদের হুটোপুটি। দিদি শ্যালো টিপে-টিপে জল খাওয়াচ্ছে। সামনে গিয়ে সটান পা ফাঁক করে দাঁড়াই। রিং করে করে সিগারেট। কখন তাকায়, তার অপেক্ষা।

তাকালো ঠিকই। কিন্তু এমন তাকানি, উহুরে বাপ, আমার হাঁটু বেঁকে যাবার যোগাড়।

হাতের ইশারায় কাছে ডাকে। চোখে খাড়াই তীর।

বুক নয়। চোখেই গুপ্তি রাজনন্দিনীর। যার রেঞ্জের আওতায় ঢুকলে যে-কোনো উক্তর-কুড়ির মুণ্ডু ধড় থেকে খালাস।

মুণ্ডুর, থুড়ি, মাথার চুল ঝড়ের তোড়ে বন্য। ঝড় থেকে উড়ে-আসা একটি ধুলো-কণাই বুঝি এসে লেগেছিল চোখে, উহুরে ফাদার, একটিই মারক চোখে সে হাঁকে, — 'কিসকো মাংতা?'

বববব ব ব ব বললুম, 'মাংতা-টাংতা কিছু না। রানীসাহেবা, এক ঘটি জজজজ জ জ জল আগর খিলায় দেগা তো ভোত মেরবানি।'

'ক্যা?' — পিলে-অব্দি কাঁপিয়ে দেওয়া বেয়াদপ হাস্কি। উপরিতন, চোখে তোমরাস্ত্র।

ঠ্যাঁটা যতই হই, ঐ দোধারি দৃষ্টিবর্শার সামনা করার প্র্যাকটিস বাপের জম্মে করিনি। ফলত, একান্ত বশংবদের মতো গর্দান-সহ মুণ্ডুটা যথাসাধ্য এগিয়ে আর লটকে দিলে বললুম, 'দেখুন, গোসা করবেন না। ভুল বুঝবেন না। এখান থেকে সাত ফার্লং দূরে আমার এক মিষ্টি-মধুর বন্ধুর বাস। আমি নিছক তার খবরগির মাত্র। আমার বন্ধুটি রোজ দ্যাখে বিকেলে বাচ্চাদের সঙ্গে আপনি খেলতে আসেন, খ্যালেন, শ্যালো টিপে-টিপে জল খাওয়ান, তারপর দলবল নিয়ে হাপিস। আমার নিষ্কন্টক বন্ধুটি যদি ঐ দেখে দেখে দীর্ঘশ্বাস মোচন করে, সে কি তার অপরাধ? বলুন! বিহিত করুন।'

রানী বিশেষ পুরুষ-অধ্যাসিত কলেজের অ্যালামনাস। পুরুষের অনেক র।ভ। দেখেছে। কিন্তু আমার ঐ বিনীত অ্যাপোলজিতেই কিনা কে-জানে, দেখলুম, ক্রোধের ব্যাল ফনা নামিয়ে সরসরিয়ে খোঁদলে। পরিবর্তে,

চোখেরই কিংখাব থেকে বেরিয়ে আসে জ্যান্ত চকচকে একফলা হাসি। বেরিয়ে, সোজ্জা আমার বুকে।

'একবার দেখাতে পারেন?' — হেসেই জানতে চাইল রানী।

'কী?' বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে, কিন্তু নুনু নয়, এক্ষেত্রে মাথা খোজাই।

'বা রে', রানী বলল, 'ঐ যে বললেন, বন্ধু!'

'ও-হো। কমল তো আমাদের নাটের গুরু।' একটা প্রিকশনারি হাসি লিক করে বলি, 'এসো না বিকেলের দিকে, আমাদের ককনিডামে। ভারি স্মার্ট ছেলে। হীরের টুকরো। কোনো স্পট নেই, তোমার দিব্যি। আসবে?'

পরদিন সেটা। সত্যি-সত্যি বেড়াতে এলো রানী। সঙ্গে পরেশ, কড়ে আঙুল ধরে।

'ওমমা!' বলেই সশব্দে গালে হাত রাখলো রানী। — 'তোমরা যে দেখছি সাত ভাই চম্পা গো!'

তারপর হাসি। হাসি সে থামাতে পারে না। হুসহুস ভুসভুস করে উঠে আসতে থাকে ঢেউ। শরীরের সমস্ত পয়েন্ট জুড়ে। পড়েই যেন যায়, হাসতে হাসতে। পড়ে যেতে যেতে কমলের জামার আস্তিন ধরে সামলেও নেয়, নিজেকে। 'স্যরি।'

আমাদের সক্কলকে ভালো লেগে গেল রানীর। শেষে সিগারেট শেয়ার।

ক্রমে ক্রমে রানীর পাস্ট জানতে পারি। বাবা-মায়ের ওয়ান পিস। বাবাটি এক আধবুড়ি মেমকে নিয়ে পালায়। বুড়ি ঠ্যাং ছুঁড়লে ব্যাক-টু-প্যাভেলিয়ান। সে এক নিদারুণ অতীতকালের কথা। রানী তখন দু'মাসের, পেটে। মায়ের নাম সোফিয়া লরেন। ইয়ার্কি না। ঐ নামেই ডাকতো বাবা। ভয়ানক সুন্দরী। মাঝেমাঝে ভয়ে পালিয়ে যেত, বাবা। বাবার ছিল ঐ রোগ, পালিয়ে যাওয়া।

'আমি বাপু মুখ-আলগা মেয়ে।' রানী পজ মেরে বলল, 'ফটাফট সবকিছু বলে ফেলি।'

'মুখ-আলগা তাতে কী', — কমল ফুট কাটল, 'বাদবাকি সব টাইট থাকলেই হলো।'

রানী সোসিওলজিতে এম-এ। মাস্তানদের নিয়ে রিসার্চ করতে গিয়ে ওয়াগন- ভাঙানিয়াদের খপ্পরে পড়ে। পাক্কা ঊনপঞ্চাশ দিন কাটাতে হয় তালেবর দাদার ঘাঁটিতে। পরে সে কিছুদিনের জন্য তালেবর দাদার মেয়েদের ট্রেনার হয়। মেয়েরা ওকে তোলা আদায় করে পকেট খরচা দিত। গোলাপুরের জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটটা ছিল পাক্কা অ্যান্টি-সোস্যাল। মাস্তানগুলোকে জেলে পুরে কেসটাই রফা-দফা করে ছাড়লে। মনের খেদে রানী লটবহর সমেত ব্যাক টু প্যাভেলিয়ান। পরে সে দুধের ব্যবসা ধরে। লম্বা মাথা, লম্বা কান, লম্বা ঠ্যাং, লম্বা থনঅলা পাটনাই রামছাগলের দুধ। এমনিতে ছাগলের দুধ বলতে গান্ধীবাবাকে মনে পড়া আমাদের নিয়তি। তথাপি, রানী ঐ বেচতো। রামছাগলের দুধ। বাঁধা খদ্দের ছিল ওর। রোজ বিকেলে ম্যাটাডরে চড়ে ছাগলরা আসতো সেজেগুজে। সামনে দুয়ে দিত রানী। পাড়ায় ওর নাম হয়েছিল মিল্কি ডার্লিং।

রানী বড় কেয়ার-ফ্রি স্টাইলে এসব বলত। বলল, গেল আড়াই মাস ধরে নাকি চিকেন পরিহার করেছে। চিকেন খেলে গরমি বাড়ে, শরীরে দুর্গন্ধ। তাইতে শুধু ভেজ। তো, গত মাসে ভায়া-সোমরস বেনারস পৌঁছে সে কী হ্যাপা। 'কোথাও এক খুরি মদ জুটছে না গো! শেষে গুরবচন সিংয়ের ঢাবা।'

'কম্বিনেশন দেখেছিস?' কমল বলল, 'ওকে আমারে দে। ও শিঙিমাছ আমি ছাড়া কেউ গাঁথতে পারবে না। কমল চক্কোত্তির নাম শুনেছো? এই যে, মেয়ে!'

'হুঁ। খুব শুনেছি। তাড়িখোর, বকবকিয়ে আর পিঠে চাব্বুশ ব্যাগ ঝুলিয়ে ধাওড়ায় ধাওড়ায় ঘুরে বেড়ায়।'

'ডাঁহা চিনোছো।' উৎসাহে কমল নেচেই ফেলে এক পাক। 'আর কী জানো কমল সংক্রান্ত?'

'পড়া-টড়ার বালাই নেই। শুধু বস্তা-বস্তা লেখে।'

'কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ!'

'ভেড়ার সঙ্গে ছাগল ভিড়িয়ে গাড়ল বানায়।'

'আই চাব্বাশ!'

'বাড়িতে কাক পুষেছে, কৃমি খুঁটে খায়।'
'যুগ-যুগ জিও রানী!'
'ভীষণ প্রুরিয়েন্ট। ওভার-ক্যুরিয়াস ইন সেক্স ম্যাটার।'
'লিউড, রানী লিউড?'
'ও, নো-ও। লিখলে-টিখলে ও রোগ সব্বার।'
'এনকোর!'
'কিন্তু লেখে বড়ো আজব টাইপ। ইলিশে পালিশ দিয়ে খালিস।'
'বহুত খুব! জবাব নেই। নাউ, প্লিজ ডিফাইন মী, এই আমি দাঁড়িয়ে—'
কমল তড়াক করে ডিং মেরে রকের মাথায় উঠে পড়ল। ভিড়ের মধ্যে থেকে মদনা দাঁত গিজুড়ে সাঁকো নাড়ায়, 'দেখিস, প্যানটুল খুলে ফেলিস নে যেন!'
'এই, চোপ!' কমলের তখন সত্যিসত্যি নেশা ধরে গেছে,— 'হ্যাঁ বলো, এই আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে!'
রানী মুখের মধ্যে জিব ঘুরিয়ে খানিক ভাবে, চকচকে চোখে তাকায়। তারপর বলে, 'তুমি আসলে কী, জানো? আই অ্যাম টেলিং হোয়াট ইউ রিয়েলি আর...'
'কী আমি?'
'ননডেসক্রিপ।'
'বলিহারি!' তিড়িং করে জাম্প মেরে রানীর সামনে এসে দাঁড়ায় কমল,— 'সবাই কেন এটা বলে রানী? তুমিও কেন বললে, আজ?'
'যেহেতু, তুমি তা-ই।' থুতুনি নেড়ে দিল রানী, 'নন-ডেস-ক্রিপ!'
'অহোভাগ্য আমার। চলো তোমাকে আরও কয়েক পিস কমল দেখাই। চলেই চলো।'
এসব ডায়লগ, সিনেমার রীল কেটে গেলে যেমন, দ্রুত চলে এবং চলতে থাকে। এবং, এইখানে তার সমাপ্তি।

কিন্তু রানীর পোঁছা ধরে সেই যে কমল হাপিস হলো, ফিরনের আর নাম নেই। আমরা মাস-টাক অ্যাড়ার গুল-মুক্ত।
শেষে দেখি, নর্দমা প্যান্ট, লাল বুশ শার্ট, চুল উসকো, ছুটতে ছুটতে একদিন : 'আব্বে, কেস কিচাইন।'
'কেন, কী হয়েছে?'
'ও মাল শালা একনম্বরের ঠেঁটি। এক মাস ধরে এত-এতগুলো সন্ধে পোঁছা ধরে ঘোরাই সার হলো। বেটির ফাৎনাই ডাউন হচ্ছে না।'
কেঁপে উঠি। প্রাণ তছনছ হয়ে যায়, শুনে।
সাত হারামির ঠেকে বসাক খানিক চিক্কু-বিশারদ। বলল, 'ঘাবড়াবার কিচ্ছু নয়। এনি হাউ এক আউন্স সিমেন ভরে দে নিচুড়ে। ব্যাস, তাইলেই হবে।'
'ধুর্র। সে তো এঁচোড়ের আমসত্ত্ব।' আমি বললুম, 'জোরই নেই, তায় জোরাজুরি। শুনছিস যে ফাৎনাই হেলাতে দিচ্ছে না, তায় —'
আমাদের সমস্যা-জর্জরিত এহেন দুর্বিপাকে জনৈক পেসেন্ট-বর্জিত ডাক্তার জলসাবরণ পাড়ুই, আসলে আমার চাঁদসি-পার্টনার, ব্যাচেলার অফ ধুর্ফন্দি রূপে পুরাকালে খ্যাত, এই দফা কমলের পৃষ্ঠপোষণে শরিক হলেন। মা কৃপাকুণ্ডলিনী নাম্নী এক সাক্ষাৎ দেবীর শরণে, তাঁরই হেপাজতে। জলসার মানত ছিল, একই ঢিলে কমল।

মা ভুলক্রমে এ শহরে। মূল থান তাম্রলুপ্ত, সে কোথায় খোদায় মালুম। তবে, যথার্থ শোকতাপহারিনী। একটু বেলা করে পৌঁছে দেখি, রিকশো অটো বাইক মেয়েমানুষ ভক্তকুল বাঁশ-ঝাড় নারকেল বেলপাতা গামছি সিঁদুর— মা কুণ্ডলিনীর ফাঁদানো সে এক বিশাল সংসার। মায়ের স্বামী বললেন, 'লাইন দিতি হবে। কাল দোপর নাকাত লম্বর আসার সম্ভাবনা।'— টোকেন ধরিয়ে দিলেন। ভেতর-বারে জুড়িদার ভিড়। কেউ বঞ্চিত ফিরতে নারাজ। মাঝেমধ্যে রোল উঠছে— 'জোয় কুণ্ডলিনী মায়ের জোয়!' 'জোয় মা কুণ্ডলিনীর জোয়!'

এও ছিল ঘটে। দ্বিতীয় দিবসের দ্বিপ্রহরে মায়ের ডাক পাই। ঢুকেই চোখ ফেরানো হুজ্জত। চেহারার প্রেক্ষিতে, সেকেলে পল্লী-বিবিদের আর্কিটাইপ। তবে, বেহদ নিমকদার। প্রতিমা ধাঁচের নাক, ইয়াব্বড়ো মল ঝুলছে ফোঁকর হতে। গা ভরতি কলাপ। কাজল-চেরা চোখ, তাতেও নানান কারিকুরি। রক্তপেড়ে শাদা শাড়ি, বক্ষবাঁধ-হারা, আঁট করে ঠাসা। তারবাদে মাংস আর চামড়ার তোল্লাই পেয়ে উত্তর-চল্লিশের আড়া মাঝদুপুরে ঝামর। পাছা-ছাওয়া চুল কুলারের ঝাপটায় উদভ্রান্ত। জলসাকে দেখি ততোধিক উদভ্রান্ত। মায়ের চরণে চোদ্দ টাকা চার আনা রেখে, মৃদু লুকনো স্বরে, 'জয় মা কুণ্ডলিনী!'

মা জিগোলেন, 'দুঃখ কী?'

যুবতীর প্রেম সঞ্চারে বিলম্ব, ছলাকলা, অলীক মন, ধন্দ-পরিহাস। কমল পর্যায়ক্রমে বলে।

মা আরও জানতে চান, যুবতী কি অতিরিক্ত ঘষা? ধর্মপ্রাণা? রমণে অনাসক্তি?

কমল ভেড়ুয়া চোখে আটকে থাকে, জবাবে গোল। তখন জলসাই আগিয়ে-বেড়ে খোলসা করে। তদুপরি জোড়হস্ত।

মা বললেন, 'ঘাবড়াসনি। গান্ধী-টুপিতেও মোরগের পালক গুঁজতে পারি। এই ঢেলাটা রাক। বাড়ি-গে জলেতে ডুবিয়ে রাকবি। রোজ চায়ের সঙ্গি দু' চামচ। তাইলিই দেকবি কলাপ গুটিয়ে সাপ ঝাঁপির মদ্যি ঢুকি যাচ্চি। নেঃ রাক। চোদ্দ টেকা চারি আনা। নেক্সট!'

অ্যাদ্দিন তারিন্দার দুলন হচ্ছে না বলে হালাক ছিল। এবার কেঁচো-সুদ্দু পুরো কাঁটাটাই রানী গিলে ফেলল। মা কুণ্ডলিনীর ঢেলার কারিশ্মা। কমল ফোয়ারার মতো উড়ে এসে ঝপাং করে বলল, 'হুররে! তোরা সব জয়ধ্বনি কর। কোর্টশিপ গ্রান্টেড। এগ্রিমেন্ট পাক্কা। তুম মেরে হো। স্ক্রিপ তৈরি। শট রেডি। ক্যামেরা, সাউন্ড, অ্যাকশান!'

সিচুয়েশান ওয়ান। রেস্তরাঁয় ধূমায়িত কাপ। কমলের মুখে সিগারেট। ধোঁয়ার বৃক্তে রানী। ক্যামেরার প্যান। রানীর মুখের বিগ ক্লোজআপ। কাপে চুমুক দিচ্ছে রানী। কপালে খয়েরি বিন্দি। বড় হচ্ছে। বড় হচ্ছে ক্রমে। কাট।

আউটডোর। ডিপ লঙশটে বিভূতিভূষণের ল্যান্ডস্কেপ। দূরে হিলহিলে জলরেখা-প্রতিম পল্লী। ঢোঁড় সাপের লেজের মতো জিগজাগ মেঠো পথ ধরে হেঁটে, দুজনে। পাশাপাশি ক্যামেরা। ট্র্যাকিং শট। একটা উঁচানো পাথরে ঠোকর খেল রানী।

কমল : 'উউফ, এই লাগলো? খুব? দেখি-দেখি।' রানীর পা ধরতে যায়। কাট।

টিল্ট ডাউন শটে রাঁড়া মহুল গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বেঁকানো-কোমর রানী। ওড়না বেসামাল। দূরে ধুমুল বাজছে। ক্যামেরা ধূসর প্রকৃতিকে ধরছে। আবছা বিকেল। রানীর জানু পেঁচিয়ে উঠে-আসা বালুপাহাড় রঙের জামা। গায়ের রঙের সঙ্গে এমন মিশেছে, যে, দর্শকদের তাতেও মনে হতে পারে, ও কিছু পরেই নেই। এই সময় নেপথ্যে ধুমুল জোর ধরবে।

শাস্ত্রীয় সংগীতের ধীর লয়ে এগিয়ে আসবে কমল। না-এসে পারবে না। আসবে। হাত ধরবে। মুখ এগিয়ে দেবে। ধুমুল জোরসে। কাট কাট।

ফলো-আপ সীনে রবিবাবুর একটা গান। মাস্ট। প্রেম বা পূজার। না, প্রকৃতির না। প্রকৃতিটা সীনে। সেইভাবে মন্তাজ। ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি, লিরিল, সিবাকা, লাক্স স্টাইলে ঘুরে ঘুরে শট। বটের জট ধরে রানীর দোল। চুল উড়বে। আঁচল বা দোপাট্টা। পেছনে নদী। একটা কবিগোছের দলছুট গাই এসে বসবে পাড়ে। গলায় কাঠঘণ্টা।

গাজনের মেলায় পেতলের বাউটি পরছে রানী। পরনে লালডুরে ছাপা শাড়ি। তেল চুপচুপে মাথা। খোঁপায় গ্যাঁদা। নাকছাবি, ঝিকমিক ঝিকমিক।

পরের সীনে রানী, সোলো। বিছানায় চিৎবুক। বুকে উপুড় জীবনানন্দ। রানীর টলটলে মুখ। আনখাই হাসছে। শব্দহীন। তখন অন্তরাটা ফুরোচ্ছে।

শেষ মন্তাজে থাকছে ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত। জুটির। পেছনে সানসেট। গান ফুরিয়ে আসছে।

রানী বলল, 'এক, আমাদের বিয়ে হবে না। দুই, আমাদের বাচ্চা হবে না।'

কড়-কড়-কড়ড়াৎ!— একটা বাজই বুঝি ফেলে দিয়েছে সে, কমলের মাথায়। চড়াক করে ঘুরে দাঁড়ায় সে : 'মামামামামানে?'

'বাপি একটা ছেলে ঠিক করে রেখেছেন আমার জন্যে।'

'ছেলে!' কমলের মুখের শেপ ইংরেজির 'ও'।

'হ্যাঁ। বাপির জেদ, ওকেই বিয়ে করতে হবে।'

'রানী!' আলতো হাতে রানীর একটা হাত স্পর্শ করে কমল, 'তোমার বাপ, থুড়ি, তোমার বাবা কি খুব জাঁদরেল? অমরীশ পুরীর মতো! বন্দুক আছে? এরম পাগলের মতি কেন?'

'হাউ ডেয়ার ইউ!' চোখ-টোখ বড় করে তাকায় রানী: 'আমার বাপিকে হিন্দী ফিল্মের ভিলেন ভাবলে তুমি, পাগল বললে? ছিঃ!' তারপর ঠোঁট-মাত্র ফুলিয়ে, ছোট্ট অভিমানি গলায়— 'আমার বাপি ভীষণ স্টার্ন আর একজিদ্দি। পুজোর ফলকাটা ছুরি দিয়ে একবার সুইসাইড করতে গেছিলেন। হারাকিরি স্টাইল। সেই থেকে বাপিকে রাগাতে ভয়। তাছাড়া বাপি এখন এইডসের পেসেন্ট। প্রোডরম্যান ফেজ চলছে। বিয়েটা দেখে যেতে চান।'

'অ।' হাত গুটিয়ে এনে কমল সিগারেট ধরালো।

'কিছু বলছো না যে!'

'কী বলবো!' একটা দীর্ঘশ্বাস ও তৎসহ কিছু ধোঁয়া মোচন করে কমল বলল, 'এরপর তো কোনো ডায়লগ হয় না। ফ্রিজশট। সেরিনেডের বদলে বেহালায় ছড়, শুধু।'

'একটা কিছু সাজেস্ট করো।'

'ভায়া-কাকাবাবু বাবাকে জানাও তুমি এনগেজড। কেস জন্ডিস, বিয়ে না হলে গলায় দড়ি। কিংবা,—' এর চেয়েও স্পিডে ধুর্ফন্দি বাৎলাতে পারে কমল—, 'তুমি প্রেগন্যান্ট। এই মর্মে স্ট্রেট ফোনই করে দাও বাপিকে। যাওয়ার আগে অন্তত দেখে যান নাতিকে।'

'দারুণ হবে কিন্তু!' বাচ্চা ছেলের মতো তালিই মেরে ওঠে রানী।

পরদিন। ফের রেস্তরাঁ। টোস্টে নুন ছেঁটাতে-ছেঁটাতে রানী : 'উঁহু। বাপি ডেট-ফেট সেটল করে ফেলেছেন। শুনতেই চাইলেন না।'

'তবে?' কমল চায়ের কাপ নামিয়ে রাখে।

'কি করব বলো।' বাচ্চা ছেলেকে হামি খাওয়ার মতো করে কাপে চুমুক দেয় রানী, 'বাপির তো বলেছি সময় নেই। আমাকে সিঁদুর-মাথায় দেখে যেতে চান।'

'আর তোমার ছেলে! আই মীন, হিজ গ্র্যান্ডসন?'

'বললেন, ও অ্যাবোর্ট করিয়ে নিলেই চলবে। তুই চলে আয়।'

‘যাচ্ছো!’

‘অফকোর্স।’ পুরো পাম্প দিয়ে বলার দরুণ রানীর হাস্কিতে টান।

‘বেশ।’ ঘাই খাওয়া মাছের আহত মুখে কমল বলল, ‘আজকের বিলটা তুমি দিয়ে দাও। আমি তো পার্স আনতেই ভুলে গেছি।’

‘ইস! চোখমুখের কী ছিরি হলো ছেলের দ্যাখো।’ বলেই রানী হাসি নামালো। প্রথমে অন্তর্হাস। ক্রমে ভুসভুস ঘুসঘুস। উপচানো পিঠের ঢাল বেয়ে নেমে আসে ঢেউ। হাসতে হাসতেই হঠাৎ দুম করে ব্রেক কষে — ‘ভয় নেই বাবা। হচ্ছে। তোমার সঙ্গেই হচ্ছে। বুদ্ধু কোথাকার!’

নাক টিপে দিল।

গোলাপী সইয়ের মাজায় সাবান ডলে দিতে দিতে

শুধালে, বল না পোড়ামুখি অরবাদে মিনসে কী ক'ল্লে!

তো, সেই রানীই কালক্রমে সিরোজে সিঁদুর পরে, নিজে ও নিজের অন্যান্য মাল সহ উঠে আসে কমলের ছোট্ট একফালি কুলায়। সে সেই সাতবছর আগেকার কথা। তারপর দৃশ্যত মামুলি সব আলনা কাসকেট পোর্টম্যান্টো সুটকেস কোলা। আর চেস্ট অব ড্রয়ার্স থৈ-থৈ করতে থাকে তার গুলতান কাতান বালুচরি পেটিকোট শেমিজ জিনস চুড়িদার সালোয়ার স্লিপ করসেট আর ব্যবহৃত-অব্যবহৃত অনন্ত-অফুরন্ত-সব ব্রেসিয়ারে। একদিন, এমনি বেড়াতে গেছি। দেখি, চাদ্দারে ব্রেসিয়ারের ছড়াছড়ি, শুধু। শাদা কালো ধূসর লাল বেগুনি পিংক তুঁতে টিয়ে পাটল আর ছাইরঙা উক্কু। তেওড় তেকোনা বর্তুল ইলিপস প্যারাবোলা বরফি সাইজ ব্রেসিয়ারের এতো থিসরাস যে কমলের পক্ষে লেখা-থামিয়ে আলুথালু হয়ে বসে থাকবার এলাহি বাহানা।

অবশ্য লেখা থামানোর ভিন্নতর অবকাশও নিতান্ত কম নয়। এবং, সেটাই বস্তুত। যেমন, রানী যখন তার চামড়ার ঘ্রাণ আর জেল্লা সমেত কমলের সামনে এসে দাঁড়ায়, যখনই, পেঁয়াজের ছিলকার চেয়েও মসৃণ অংসকূট এবং বেশ-কিছু নিচে চর্বি ঝরে যাওয়ার পরেও অবাক-হারে ওলন ও চোস্ত তার বক্ষগোলক-দুটি, স্রেফ ও-দুটি, কমল তো ভেবেই অস্থির হয়ে ওঠে, এ মেয়ে স্রেফ বডিসের হুকগুলো খুলে দিলেই তার, কমলের, সারাজীবনের লেখা স্থগিত থেকে যাবার পক্ষে এন্তার। এমনই উক্কু, এমনই উচ্ছ্রায়ী, এমনই সুডৌল, এমনই দ্রঢ়িষ্ঠ সে-দুটি। এবং, পুরো চিৎবুক হলেও একেবারে প্লেট হয়ে মিলিয়ে যায় না, সে-দুটো। কমল সাক্ষী।

বস্তুতই, জাগুয়ার-প্রিন্টের স্যাটিন ব্রা আর হাই-ওয়েস্ট বুস্টার ব্রিফ মাত্র পরেও আরামে ঘোরাফেরা করতে পারত রানী। হাঁটু আর ঊরুর মাঝে স্ট্র্যাপ আর গার্টার। কখনো গামছা বাঁধতো। বুক ও নাভির মধ্যিখানে। মাখন-শুভ্র ডায়াফ্র্যামে।

এ-ভিন্ন পুরুষসুলভ আরও-কিছু গুণ ওর ছিল। ছিলই। ছিল না বললে দাঙ্গা। রানী মোট বইতে পারত। রানী সংকল্প নিতে পারত। রানী ভালোবাসতে পারত। রানী কমলকে চেপে শুতো। জয়গুরু।

রানী গান গাইতে পারত। ক্রৌঞ্চমিথুনের খুব বেসামাল মুহূর্তেও, কতবার,— আন্তরিক-প্রবল যূথবদ্ধ জংঘার তাল ও লয়কে স্তব্ধ করে দিয়ে তার গ্রীবা বেয়ে উঠে এসেছে জদ্দন বাঈয়ের কামদ গ্রেন, এমন কী। পরে সেই গান কমল আমাদেরকে রিওয়াইন্ড করে শোনায়। নাথুনিয়া হায় রাম বড়া দুখ দিনা...

রানীর পাছদুয়ারের ঢিপি-দুটো ছিল সবচে কাম্য, কমলের। কামনা আর কি, প্রবল ভক্তি। মাঝেমধ্যে জিরিয়ে নেওয়ার গণ্ডোপধান। ওখানে মাথা রেখেই 'দ্য সেক্সুয়াল টেম্পারামেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান বিহেবিয়ার প্যাটার্নস অব ডগস' শুনিয়েছে ওকে। একদিন কাপে চক গুলে ঢের ক্ষণ ধরে দুটো আল্পনা দিল, ওখানে। তখনও ওদের ক্যামেরা হয়নি। ফলে একা কমল ছাড়া ও-জিনিশ কেউ দেখতে পাবার না। রানী বায়না ধরল, দেখবে। মহা ফ্যাসাদ। কমল চিন্তায় পড়ল। 'কি করে দেখাই বলতো?' বললুম, 'আয়না ধর, দেখবে।' তাই সই। ধরল। রানী বলল, 'এম্যা, এরম নাকি আমারটা? ম্যাগো!'

রানী জগিং শুরু করে দিল। পাশাপাশি যোগ। যোগাসন। রিং। বার। প্যারালাল বার। প্রেস। বেঞ্চপ্রেস। একদিন গিয়ে দেখি মুগুর ভাঁজছে। ডাম্বেল। শেষে ডন। বুকডন। ডন-বৈঠক। কালক্রমে রানী আরও

স্বাস্থ্যবতী হয়ে উঠলে আমরা একযোগে দেখতে গেলুম। কমলকে বললুম, ‘আর কি, এবার সারারাত পিদিম জ্বেলে শো। চোখে আরাম পাবি, দেখিস।’

কমলের মুখে হাসি নেই। খোমা শুকিয়ে খণ্ড-ৎ।

‘কী হয়েছে বল তো?’ আমি না-জেনে ছাড়বো না, এভাবে তাকাই।

কমল আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে, যেন প্যানটুল নামাতে বলবে, এই সতর্কতায়, বলল, ‘জানিস, একটা কিচাইন হয়েছে।’

‘কিচাইন!’ মুখ ছুঁচলো করে তাকাই। ‘কী রকম?’

‘রানীর অনেক ব্রা, তুই দেখেছিস। সব স্ট্যাটার্ড। হচ্চে কি, রোজ একটা করে গায়েব।’

‘হুলো বেড়াল হয়তো। ওরা খুব ব্রা-প্রিয়।’

‘না-না,’ কমল হাত নেড়ে বলল, ‘পরের দিন ফেরতও আসছে। দেখি, অনেকটা করে শুকনো বীর্য। বোঝ, রানী ঐ ব্রা আর পরে! ঘেন্নায় চোখ উল্টে দেয়। শ-দেড়শো টাকার এক-একটা ব্রা, সব মিছিমিছি রিজেক্ট হয়ে যাচ্ছে।’

সত্যি, কেস জন্ডিস। আমরা গোপনে লেগে পড়ি ব্রা-পাচারকারীকে ধরতে।

ধরাও পড়ল একদিন। স্যানিটারি পাইপ বেয়ে সন্তর্পণে নেমে আসছিল। তাজা আঠারো, হাফ প্যান্ট। ঘচাং করে মাঝপথে ডেড়েমুষে আটক।

আরেকদিন। প্রায় শোকসন্তপ্ত ছুটে এলো কমল। চুল উসকো। জামায় ইস্ত্রি-বিয়োগ। পাজাম ঢিলে। বললুম, ‘কি রে, কেষ্ট ব্যাটা ফের দুষ্টুমি শুরু করেছে বুঝি?’

‘না-না, এ কেস আরও জন্ডিস।’ কমল এবারও, পূর্ববৎ সতর্কতায়, আড়ালে নিয়ে গিয়ে,— ‘আগে বল, কারুক্কে বলবি না। তোর বউকেও না। তারপর বলছি।’

‘কারুকে না। তোর কিরা।’

‘কারুক্কে না। তিন মাত্রায় উচ্চার্য। তোর দেখছি আড়াইয়ে হয়ে যাচ্ছে। সে যাকগে।’ কমল গলা পালটে বলল, ‘জানিস, রানীর লিভার হেবি চোস্ত। কখনো বাতকর্ম শুনিনি। অতিসার চোঁয়াঢেকুর নাড়িমরা, মায় ফুসকুড়ি জ্বরঠুঁটো কাঁকবেড়ালি কিংবা পাঁকুই আঙুলহাড়াতেও ভুগতে দেখিনি। একদিনও কোঁৎ পেড়েছে বলে রিপোর্ট নেই।’

‘বেশ তো। তাতে চিন্তার কী?’

‘... কিন্তু, বেছনায় হিসি! ওহ।’ কঁকিয়ে ফেলার মতো গলা কমলের। ‘কাঁথা তুলে ধুতে হয় আমাকে, ভাবতে পারিস! একটা টোটকা বাৎলা ভাই।’

আমি ততদিনে বেশ কিছু হেকেমি শিখেছি। জলসাবরণের সঙ্গে চাঁদসির দোকান করার সুসিদ্ধি। বললুম, ‘ফিকির করিস না দোস্ত। নিসিন্দা পাতার গুঁড়ো জলে ভিজিয়ে খাওয়া। সাত দিনে এ জ্বালা থেকে মুক্তি। সঙ্গে তেলকুচা গাছের পাতা আর ডাঁটাচচ্চড়ি। রাতে বউকে উপুড় শোয়াবি না, নিজেও হবি না। বুঝেছিস?’

সেই দাওয়াই চলল এক মাস। কোনো ফল নেই। ধুতে ধুতে কমল পরেশান। রোজ রোজ চিৎ শুয়ে রানীরও ঘেন্না ধরে গেল। একদিন বলল, ‘আজ তুমি শিব, আমি মাকালী।’ ওমা, রানী সেদিন লুঙ্গি পরে এলো। বালাই ষাট।

এর পরদিন থেকে রানী বিলকুল হিসি-ফ্রি হয়ে গেল।

তালে, ওদের দাম্পত্যের কথা কিছু হোক।

খিড়কির ফাট দিয়ে রোদ ঢোকে, আর, উষ্ণ ধূমায়িত কাপ হাতে রানী। মাথার চুলে বিলি কেটে কমলকে জাগায়। গুনগুন। তারপর অমনি তাকিয়ে। অবিরল তূণীরপাত। একদিন ঘুম ভেঙে উঠে রানীর চোখের দিকে

তাকিয়ে কমল পাগল হয়ে যায়।

এমনিতে, পাগল করার মতো রানীর আরও কিছু ছিল। ছিলই। যেমন, ঘুমন্ত তনুর মওকা নিয়ে ক্রেজি গোছের এক আরশুলা উঠে আসে তার বৃন্ত-চূড়ায়। ফের স্লিপ খেয়ে পড়ে যায়। ফের উঠে আসে। ফের পড়ে। ফের ওঠে। পড়ে যায়। মিনিট আড়াই কি পৌনে তিন ধরে কমল ঐ খোশদৃশ্য দেখে গেল। শেষে হাল ছেড়ে ঐ হতাশ অস্রফলা ফিরে যাচ্ছে নাভির ঢাল বেয়ে, খপাং করে ধরে দাঁত দিয়ে পিষে তাকে গিলেই ফেলল কমল। ঐ পাগল-করা চূড়া! বাস্তবিকই, অপরূপ মসৃণ ও পেলব ঐ চূড়া। দূর সমুদ্র থেকে উঠে-আসা দুটি উল্লোল, যেন। উঠেই বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু হয় না। জেগে থাকে সারারাত। হ্যাঁ, জেগে।

রানী বেশ গোছালো। ঘর গোছাতে বিশেষ ধুরীণ। ইয়াকের চর্বির মাফিক নরম আর গদগদে বিছানা ওর। শুয়ে ডেক জেটি ঘাট বেবাক ভুলে যায় কমল। বলা বেশি, সিতাভ কাভারলেটই রানীর ফার্স্ট চয়েস, কিন্তু দিনে পেতে রাখে অপাপবিদ্ধ শীতলপাটি। রাতে দরিয়ার পাড়ে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে এরম মেয়ের গাত্ররঙ চুরি করে ওর কুশন ওয়াড়। ডিভানের ক্ষুদে ক্ষুদে বেড়াল-পায়া ঘিরে পার্টিকালার্ড জলচৌকি। ওর পেলমেট থেকে সটান ঝুলে থাকা আলোপিছল রঙের মোটা ক্যাসমেটের পর্দা আলো-ঠাকরুণকে লজ্জা দেয়। কমলের হাঁটুমাত্র-সমান ছোট্ট মেহগনি কাঠের বুকশেলফ, মাথায় তার ধবলরঙা স্ট্যাচু অব লিবার্টি, অনন্য একপিস। পাশে আঁখিমণিতে বিলোল কটাক্ষ তুলে গৃহাঙ্গনা রানী স্বয়ং, খুরপি-হাতে। এ-ভিন্ন, ধুনখারা রঙের সানমাইকা-বসানো টেবিলের ওপর, যেখানে বসে কমল এই মহার্ঘ উপন্যাস ইনকিউবেট করছে, ছয় বর্গফুট সাইজের পুরু গ্লেজার, নিচে এরিক গিলের সেই কল্পিত ঈভ ও তার ব-দ্বীপ ফুঁড়ে লকলকে কুম্ভীলস।

রানী রকমারি ডিস জানে। ওর প্যান্ট্রিতে মশল্লার হরকিশেমি বাহার। পারে না, এমন কী! মোগলাই, চিনে, সাউথ। রুগির আহারও বোঝে। একদিন গহনার বড়ি দিল, সঙ্গে পাথরবাটি ভর্তি সাগুর পায়েস। আরো একদিন, পকেটে আমার খলবলে ছোটোবউ। কমলকে বললুম, একটা মুরগি বল। ওমা, রানী মাখনা-গুঁড়ির চপ ভেজে দিল। ভেতরে বিফের পুর। বললুম, আরেকটু দাও। শেষে, টলমল পায়ে উঠতে যাচ্ছি, টুক করে এগিয়ে এগিয়ে দিল ছোট্ট একটা ডিবে। বক্ত্রশোধী : এলাচদানা আর খৈনি।

রানীর বাগানবাড়ির শখ। ওর বাড়ির লাগোয়া টেরেসে ছোট্ট একফালি চৈত্ররথ। একদিন বেড়াতে গেছি, দেখি, হাঁটু মুড়ে বসে টবের মাটি কোপাচ্ছে। গোলাপি হেসে বলল, এসো তোমাকে গুড় চী চেনাই। হাতই প্রায় ধরে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালো টবের পাশে— এই দ্যাখো ক্রিসেনথিয়াম। চন্দনকচু দেখেছো? পাতা শুধু দেখে রাখো। ক্রোটন। এটা বোগেনভেলিয়া। আর ঐ দ্যাখো পারিভদ্র। স্বর্গের ফুল। দেখেছো কখনো? মোরগঝুঁটি চিনে নাও, ঐ-যে, পাশে ক্যালেন্ডুলা। আর, এই দ্যাখো নয়নতারা।

যাহব্বাবা! মিয়া সের তো বিবি সওয়া সের! দেখলুম, নয়নতারাই বটে। একজোড়া। আমাকে দ্যাখে, আর কেমন পালটি খেয়ে যায়। চোখ না টেরচে, শুধু ঐ তারা দিয়ে হাসা। আ, হাজার প্র্যাকটিস মেরেও পর্দার রঙ্গিনীরা পারে না যা আনতে। ঐ ছিল রানীর ট্রাম্প-কার্ড। ক্ষণে ক্ষণে ডিক, আর ফতে।

রানী সাজতে ভালোবাসে। হালকা মেহেদি-রঙা ববড চুল ওর। কোনো উইগ কিংবা বানানো টপনট নেই। একবার সে ডোনাট বেঁধে কলেজস্ট্রিট পেরোয়। মুখোমুখি সংঘর্ষে একটি ট্রাম ও একটি ডাবল-ডেকার ওখানেই থ্যাঁতা। পরে সে চুল ছেঁটে নেয়, এবং স্টোপস। রানী চেয়েছিল নিজস্ব হেয়ার-ডু। ওর চুল মিহি আর আলো ঝরে। ডগার কাছটা কার্লড। তাতে ঘাড়ের শাদা ও সুঘ্রাণ। খুব সরু সূক্ষ্ম রানীর আইলাইনার। পাতায় মৃদু শ্যাডো আরোপ, ক্বচিৎ। আঁজনও মওকা বুঝে। কেননা চোখে সাংঘাতিক স্ফটিক।

ওর বাঁকা শঙ্খের মতো কাজললতা। গোল, খেলনা-টাইপ কলসির মতো সিঁদুরদানি। তেমনি, ষাঁড়ের সরু ছুঁচলো পিংকি শিশ্নের মতো লিপস্টিক। ওর লম্বাটে আয়না, এবং ওভাল-শেপড। তাতে অজস্র বিন্দি। খয়েরি নাবিকনীল ক্ষুদে ক্ষুদে ডিম।

এবং, সাজাতে। কমলকে মাঝেমধ্যে সোনামণি বলে ডাকে। 'সোনামণি, ও কী করছো! ওভাবে কেউ পাউডার মাখে! এসো মাখিয়ে দিই। লক্ষ্মী সোনার মতো চুপটি করে শুয়ে থাকো দেখি। চোখ বোজা। উঁহু,

বোজা। তাকাবে না কিন্তু!' — দু' কৌটো বড় ট্যালকম পাউডার হাতে রানী। তারপর কোথাও বাদ নেই, ঝুরঝুর ঝুরঝুর, পাউডার পড়ে যাচ্ছে। মুখ, গাল, নাকের পাটা, গলা, বুক, নাভি, ক্রমশ নিচে ... হাঁটু, মালাইচাকি, পায়ের আঙুল, নখ ... ঝুরঝুর। ... 'এরপর দ্যাখো আমি কী করি, উঁহু চোখ বোজা, খুলবে না কিন্তু' ... রানী শাড়ি ছাড়ছে। কমল বুঝতে পারে। শায়া, ব্লাউজ, তারপর সব। আলনায় কাপড়গুলো রাখে। রেখে, ঝপাং-সে ডাইভ। ... কমল আগেভাগে বলে দেয়, 'রানী, নো মোর প্লিজ! কাল আপিস।'

'... নারী সমুদ্র ছাড়া আর কী, বল!' — একদিন বালিতে শূন্য বোতল পুঁতে ছড়ানো বাদামের খোসা দিয়ে র‍্যামপার্ট গড়ছে কমল, বলল, 'সমুদ্রই তো। এক বিশাল মহাযোনি পয়োধি এই নারী।'

'আর পুরুষ?' : এক চিমটি নুনু জিবে ফেলে, আমি।

'পুরুষ কেসটা হলো,' — কমল বলল, 'ঐ উষ্ণ মাংসল অলীক পাথার-কিনারে বাল্বের ছেঁড়া ফিলামেন্টের মতো অধীর কাঁপুনি সহ দাঁড়িয়ে থাকা পৌনে ছ'ফুট লম্বা একটা উচ্ছ্রিত পুরুষাঙ্গ। মাত্র।'

এইখানে এসে অঙ্কচিহ্ন ডিকোড হলো। মানে, রকের মাথায় নাঙ্গা দাঁড়িয়ে সেই-যে ব্যাটা বলেছিল, আমি এক মূর্তিমান যৌন-অহঙ্কার, — এইখানে তার লেজুড়। এই রেঞ্জ, এই বিস্তার, এই টেকনিক দাম্পত্যের দিন-সমূহে আরোপ করতে চাইছিল কমল। চাইছিল, সেক্স সেক্স সেক্স-সমাহিত, সেক্স-পরিবৃত, সেক্স-অবিচ্ছিন্ন, সেক্স-তদভিন্ন জীবনের বাকিটা হয়ে উঠুক এমবারগোহীন ব্রেকহীন বিরতিহীন এক মেগা সেক্স-সিরিয়াল।

ঐ অম্ভোরাশির পদসঞ্চার, লাথি, অলস আড়মোড়া, হাইতোলা, জৃম্ভণ, তার হাঁচি কাশি নাকঝাড়া, ঘাম থুতু কফ, ক্কাথ ও স্রাব — কী না ভালো লাগে কমলের। রানীর হিসি। এ-ভিন্ন, রানীর পেছনে জিব বুলিয়ে পাগল হয়েছে কতবার! দ্যাখে, কিরকির। নোনা-নোনা। নোনা থেকে লোনা। লোনা থেকে লবণ। লবণ থেকে লাবণ্য। কত নুন খেয়েচো রানী! সব সমুদ্র কি তোমার দেহে? আর খেয়ো না। এতে সৌন্দর্য হারায়। অবিকগুলি খসে-খসে সহসা খোয়ায়।

রানীর পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারগুলো দারুণ চোখালো, — যতখানি চোখালো সে নিজে। দুম বা হুটের প্রতি কোনই আনুগত্য ছিল না রানীর। প্রতিবার চাইত সুস্থ সবল ও ধীরগতি যৌন-সংগ্রাম। এবং পৌনঃপুনিক। খুব অকথ্য মুহূর্তেও গান ধরতে পারত, সে-কথা আগেই বলা। এ-বাদে চরমতম লহমায় কী অবলীলায় বদলে যেত প্রাচীন ইতালির মিনিয়েচার মডেলে। কমলের মাংস রূপান্তরিত হচ্ছে নৈনিতালের হিমখণ্ডে, তার আগেই রানী সেরে ফেলতো এক হাজার মিলিলিটার জেলিস্নাত ঝিরের দীর্ঘব্যাপী কাঁদন।

তখন তো এমনি, যে-কোনো মুহূর্তে একজন আরেকজনের মুখ বুক আদর করে দিয়ে কেটে পড়ছে। কিংবা, পাছায় চিমটি। কমলের হাইব্রিড বাগানে সারারাত ব্যাঙের ঘ্যাং-ঘ্যাং, আর ওরা দু'জনে ঘরের মধ্যে মোম জ্বেলে ক্রমাগত জেলিস্নান। ওদের বিছানায় কালো ডেয়োঁ পিঁপড়ের সারি পড়ে গেছে, তদুপরি হঠাৎ হঠাৎ গুবরেপোকার এরোপ্লেন। সরসর করে টিকটিকি এসে পোকা তুলে নিয়ে পালালো, দুটি নেংটি অদূরে গোঁফ নেড়ে গাঁড়জ্বলুনি নৃত্যে। মাদল বাজিয়ে পাহাড়ের অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে আদিবাসী ট্রুপ। তখনও দুজনে পরস্পর নেশায় হাপিস। কখনো কেউ বিড়ি খেতে কিংবা হিসির ঠেকায়, তখন পিঁপড়েদের পুনরপি কনভয়।

স্তনের রিফট-ভ্যালি ঘিরে পেচ্ছাপ। করেনি, কী? ইভন, কমল তো অ্যাইসা পাগলা পাবলিক,— ঝোঁকের বশে একদিন ভেতরেই হিসি করে বসল; এবং কমলই খোদ,— ইউ-টি-আই থেকে রেয়াত পাওয়াতে, রানীকে, ডাক্তারের হেপাজতে নিয়ে গিয়ে জরুরি শলা, ট্যাবলেট, তথা ডাক্তার যখন ভুরু তেরিয়ে বললেন, 'এ তো কেলেংকেরিয়াস কাণ্ড মোশায়, করেছেনটা কী!—' কমল তখন দাঁত কেলিয়ে যথাসম্ভব হাতও মললো।

ডাক্তার সাত দিনের জন্য রানীকে রিমান্ডে নিলেন। অর্থাৎ, কমলের হপ্তা বনধ। ঐ সাত দিন কমল লুঙ্গির গিঁট বাঁধতে বাঁধতে এ-ঘরে ঢোকে আর গিঁট বাঁধতে-বাঁধতেই বেরিয়ে আসে। রানী গালময় জিব ঘুরিয়ে চুকচুক শব্দে তাকায়, চোখ ঝিঁকিয়ে ভ্যাংচায়। মোম জ্বালা থেকে বোঝা যায় বর্ষার একটি পিটিশনরত কোলা ইতিমধ্যে কমলের চেয়ার কেড়ে নিয়েছে। সে এখন মশারির মধ্যে ঢুকে সারারাত ঘ্যাং-ঘ্যাং ঘ্যাঙানি গেয়ে যাবে, শুধু।

বলার কথা এই যে দুজনেই দুজনের বীজমন্ত্র, বেঁচে থাকার। ভাইটালিটি। উভয়ের উভয়কে অবিরল পান। শরীর জুড়ে কুলকিনারাহীন অথৈ প্রশ্ন সব। হাইহাই প্রশ্নমালা। তখন ফের শব্দের খেলা। ঘুমন্ত বা অনুস্বার গোছের শব্দ খুব শূন্যে লাফিয়ে ঘুরপাক খায়। তখনও হাঁ-মুখ, উভয়ে। টুপ-টুপ করে ফোঁটা ঝরে পড়ছে, জলের। সিক্ত নোলা, সিক্ত ঠোঁট, সিক্ত ডানা— শুধু কণ্ঠা শুকিয়ে নিদারুণ কাঠ। তদাবস্থায় কোন অলৌকিক হেকমতে খোদায় মালুম, গাভীর মতো গ্রীবা-মাত্র সরু ও লম্বা উঁচিয়ে রানী তার কচি বাদামের মতো গোলাপি অধর কাঁপিয়ে টিপিক্যাল মেয়ে-গলায় বলছে, 'কালকের মতো করে একটা কামড় দাও। ঠিক কাল যেভাবে দিয়েছিলে।'

দেখতে দেখতে রানীর পেটে বাচ্চা এসে গেল।

সলেমান চাচার ছোট নাতিন ইস্কুল যাওনের পথে একটা থন দ্যাখে, শুয়োরের। আর শিবথানের মাথা

'ইশ! ... এ তুমি কী করলে!' নিজের সজাগ তৎপরতাকে অকস্মাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে দেখে সর্বাঙ্গে আঁৎকে ওঠে রানী।

কোঁক করে সাঁধি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল কমল। তখনও তামামি লালাটুকু ঝরতে বাকি। কালানো জলে ঝাঁপ দিলে যেমন, সেও হঠাৎ ভীত বোধ করে প্রখর। যেন, দাঁড়া বেয়ে নেমে গেছে শীতল বিদ্যুল্লতা, একটি।

উক্তপ্ত বেজার রক্তঝরা দিনগুলি নিরুপদ্রব ও বেবাক পেরিয়ে গেলে এমনি, দীর্ঘ আড়াই দিন রানী কথা বলেনি, তারও পর।

'চলো অ্যাবোর্ট করিয়ে আসি।' যে-কথাটি সে সর্বাগ্রে বলেছিল, তারপর।

কমল গরস্বীকার।

'ধাৎ! রখো না।' আলতো থাপ্পড় মেরে গাল টিপে দেয় ওর। মমতা ভরে।

'না-না। আমি এইটুকুন মেয়ে, পারব না। ঘড়ি-ঘড়ি দুধ চোষানো, চান করানো, হাগু-সুসু পরিষ্কার, রাতদুপুরে ওঁয়া-ওঁয়া— এসব সওয়া কি চাট্টিখানি কথা? আমি বাবা পারব না। তুমি নিয়ে চলো, ব্যাস।'

রানী রোজ রোজ আখুটি ধরে। কমল যায় না।

একদিন দুপুরবেলা ওদের বাড়িতে নেমন্তন্ন। খাওয়ার টেবিলে কী-এক সর্দারজির জোক বলেছি, তাইতেই দেখি রানী বেদম হাসছে। খিলখিল খিলখিল। মাঝেমধ্যেই হাসতো, এমনিতে। কারণ আর সিচুয়েশন তৈরি করে, হাসি। সেদিনও তাই। মাছের কাঁটা চিবোচ্ছে, আর হাসছে। কমল দুম করে বেরিয়ে এসে বলল, 'দ্যুৎ, কী হচ্ছে কী! বাচ্চাটা কাঁপছে যে! অত হাসে?'

এ থেকে মাস-কিছু পরে, বয়লারি-কায়দায় ফোরসেপে টানা তুলতুলে বেবি তুলি, তুলতুল, অধুনা তুতুল কালক্রমে কিভাবে সেই 'চলো-অ্যাবোর্ট-করিয়ে-আসি'-মায়ের বুক থেকে বুকের সবটা কেড়ে নিল, তা নিয়ে এক স্বতন্ত্র আখ্যানের অবকাশ। আমরা এবারেও সখ্যে ও সাক্ষ্যে সেরা। হৈহৈ করে গেলুম কমলের 'ধ্যাৎ-রাখোনা'-কে দেখতে। দেখি, সবুজ ঘেরাটোপ দেওয়া পরপর তিনটে বেডের একটিতে, মা ও ছা শুয়ে। খোলা জানালার হু-হু আলো। খাটের পাশে দুটো লোহার টুল, বরফের চেয়ে খানিক গরম। কাবার্ড টপে উষ্ণ জল, ট্যাবলেটপত্র। সিরিঞ্জ। দরজার ওপরে ফ্রেমে বাঁধানো মইসে-ধরা করুণাময়ী মাদার মরিয়ম ও স্নেহসিগ্ধ ক্রাইস্ট।

রানীর ফুলবাগিচায় ফুলেরা উন্মুখ। কে যেন আসবে!

মেটারনিটি থেকে প্রত্যাগমের দিন দুই বাদে বাড়ির কেবাড়ে আঁক কেটে যায় ধুমসো গোছের এক হিজড়ে। সে আরেক অশান্তিকর পরিচ্ছেদ। পরদিন ঘুম ভাঙে ওদেরই আলকাপে: 'আর-এ বউয়া কে বাপ্পা!' টাক-ঢিন টাক-টাক ঢিন্না। 'মৌগা শুতে মৌগি সং, হাম তো শুতব তোহরে সং, চলিজ্জা সা রা রা র র র র র র র'— টাক-ঢিন্না টাক-ঢিন্না— 'লে খচাখচ দে খচাখচ, তনি হেনে তাকো হো ভৌজি ...'

ও হরি, রানী ৫১-র ওপরে উঠতে নারাজ, মোটামাসি খেপে গিয়ে ঘাঘরা তুলে দ্যাখায়। বলে, 'পানশো-একের থিকে ইক পইসা কম লিব নাই।' থলথলে কালো-পারা গোদা-গোদা পা। খোলা খোঁপায় আরও

বীভৎস মাসি। কমল খিড়কির ফাট চিরে তাকায়, সঙ্গে খাতা-পেন্সিল, ক্যামেরা। রানীকে বলে, 'এ চান্স আমি মিস করবো না। টেপ করবো, ছবি তুলবো, ছক্কাগুলোকে খ্যাপাও—'

'জিসকি মৌগি ফাটল ওকর ভি বড়া ভাগ হ্যায়, আঁগন পর লিটা দো বিছাওন কা ক্যা কাম হ্যায়!'— ঠকাস-ঠকাস তালি। ঘূর্ণিঝড়ের মতো খেমটাবাজি। পরের লাইনে কী আসতে পারে ঠাহর করে তরাসে দরজা বন্ধ করে দেয় রানী।

'আর-এ বউয়া কে মাই!' ......

রানীর বুক-দুটো গাভিন বুনোশুয়োরীর মাফিক ভাপানো হলে কী হয়, বোঁটা-দুটো ছিল ভয়ানক করুণ, তথা ছোট্ট। আনতুলে। বাঙালি-নিপল তো নয়ই। ক্ষুদে ক্ষুদে। পুরো ঢুকত না তুতুলের মুখে। অথচ ওর চাই। ও অতৃপ্ত। খুঁখার। একদিন আচ্ছা করে কামড়। উঃ মা গো! .... রানীর সে কী চিৎকার! পাড়ায় তখন সবেধন একটি নেড়ি। কুণ্ডলি পাকিয়ে হরদম নিদ্রায়। কিছু বুঝে উঠতে লেট হলে যেমন, ঘুম ভেঙে উঠেই মুখ-টুখ গগনে তুলে পাড়ার ইয়ার-দোস্তদের উদ্দেশে বেবাক হাঁক: 'ভোউ-উ-উ- উ-উউউ—'

কমল বাগান থেকে ছুটে এসে বলল, 'আঃ, কী করছো! না-পারলে আমায় বলো।'

তারপর কমলই চিপে-চিপে, গেলে-গেলে, ঝিনুকে দুইয়ে দুধ, তুতুলের মুখে। এসব কষ্টের খতিয়ান লিখে রাখে না কোনো জিনিয়্যালজি। অথচ কী নিদারুণ লেখ্য! এবং, উল্লেখ্য!

তুতুল যেদিন প্রথম হাঁটি-হাঁটি পা-পা, সেদিন ওরা ক্যামেরা সহ জঙ্গল বেড়াতে। রানীর কনুইয়ে দুধের ফ্লাস্ক, ন্যাপকিন, গরমজামা। তুতুল তিনদিন 'গ' করেনি। যে-কোন মুহূর্তে সম্ভাবনা, তাই সরঞ্জাম। করলো। একটা বনেদি কাঁঠাল গাছের তলায়। শান্ত, নিরিবিলি, শীতল ছায়ায়। সে-ও ঐ প্রথম। কমলের প্রথম ক্লিক। সে-ছবি পরে প্রিন্ট হয়ে ড্রইংরুমের দেয়ালে। সেথায় লেখা : 'ইউ আর রেসপন্সিবল ফর ইওরসেলফ।'

'জানো,'— কমল এলেবেলে বলল, 'একে দেখি আর আমার শিশুকাল মনে পড়ে। আমিও এমনি হাসতুম। এমনি কাঁদতুম। এমনি রাগ। এমনি প্যাশন। এমনি হাগতুম। হাগতুম আর খেতুম।'

'ইস, তুমি খেতে বসে এইসব!'— রানীর মুখে পাঁপড় একখণ্ড।

'মাইরি।' কমল হাসতে হাসতে: 'তখন তো ঘর পেরোলেই পেয়ারা পাতা, গিরগিটি, আরশোলা, উঠোন ভর্তি। আমি দেখি, আর অ্যাই-অ্যাই করে থাবা-হাতে তাড়া। মাঝেমধ্যে থেমে, একটু একটু করি, আর খাই।'

'কী?' রানী আতঙ্কিত।

'পায়খানা।'

'ওয়াক!'

তুতুলও এমনি। তবে খায় না। পায়খানায় ওর অরুচি। খেতে, আর করতেও। তাই সে সপ্তাহে এক বা দুই ঢেলা। তখন কষ্ট। পরিত্রাহী ক্রন্দন। রানী চোখে-জলে। পেট থাবড়ায়, পানের বোঁটা সেঁদায়। পারলে ফুঁটোয় প্লায়ার্স ভরে টেনে আনে। কমলের কবি-হৃদয় পিছল খেয়ে বাড়ির বাইরে। সে হুহু কেঁদে ওঠে।

গোলাপসুন্দরী ছিল বাড়ির পরিচারিকা। হোয়াট ইজ ইন এ নেম! খেঁদির মতো নাক। পেঁচির মতো নকশা। তেমনি ভোঁদি। রানীর বকুনি খেয়ে পরেশান। তুতুল হরদম ওর কোলে। গোলাপ ওকে পাখি দেখায়। কাক, শালিখ। বেড়াল টিকটিকি ইঁদুর, আরশোলা। তুতুল তাড়া করে। দেখে দেখে কমলের বুক গদগদ। এ বাপ আমার! আয়, আমার বুকে আয়!— টেসেলেটেড মেঝেতে গড়াগড়ি খায় কমল। দু-হাত বাড়িয়ে বাছাকে হালকা পুটলির মতো শূন্যে তোলে, চুমু খায়। বাছার পোঁদ পাছা রাং ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দ্যাখে কোনটা কতখানি তার নিজের মতো, কোনটা পেয়েছে মায়ের।

কমল ভেবে দেখল, পুরুষ জন্ম দেয় শরীর থেকে। যেমন তুতুল। তুতুলও একদিন জন্ম দেবে শরীর থেকে, অন্য এক কমল বা তুতুলকে। এভাবে একটা পর্যায়। যা শেষ হবার নয়। রানীরা ধারণ করে। করতে বাধ্য। কমলরা যদি ধারণ করত, করতে পারত, কোনদিন, তাহলে আর জন্ম হয় না। তখন বিপর্যয়। তো, তুতুলে-কমলে এই যে একটা তাগা, এ পর্যায় বা ক্রম। এরই পেছনে আনন্দ। বেঁচে থাকা। সত্যের দিকে ধাবা। কমল আরও ভেবে দেখল, রানীরা এক্ষেত্রে পরজীবী মাত্র। অন্যের জিনিস নিজের বলে ভাবতেই জীবনের সমগ্র। রানীর শরীর রানীর নিজের নয়। তা-ও একজন পুরুষের। এবং বাঁধা। এতে মজা। এই নিয়ম। এর বাইরে হাহাকার, শুধু। কমল এভাবে নোট করে রাখে, এসব। টুকে। ব্রেন, সাইকো আর সেক্স — সেই তার মনন। সে আসলে এই তিন নিয়ে সত্য পেতে চাইছে। এবং মুক্তি। ততদিন এই শরীর ঘিরে থাকা। পুরুষ রূপে। পুরুষের গুণ, তুতুল, রানী, খাট, তাকিয়া আর খাদ্য নিয়ে।

তুতুল ওদের ভালোবাসতে শুরু করে, সেটা বছর দুই আগে। এখন তুতুল সাড়ে তিন। না, পুরো সাড়ে না। সাড়ে হতে তখনও পাঁচদিন। তুতুলের ভালোবাসার প্রথম পদক্ষেপ, মায়ের আঁচল ধরে মাকে কেড়ে রাখা, বাবার কাছ থেকে। পুরুষোচিত লক্ষণ। এতে, তুতুল যে কমলের রক্ত, এবং পরে হারামি হবে, এটা বোঝা যায়। বাপকে বলত গুণ্ডা, মাকে গুণ্ডি। আর বলত, 'বাপি, আজ আমি আপিচ যাবো।'— এবং ডটপেন গুঁজে।

মুডে থাকলে অনর্গল গান। মালা-ডি গানটা তখন খুব। সে দিব্বি সুর করে। বন্ধুরা যে শুনেছে, 'বাঃ চমৎকার! এবার ওকে একটা মাস্টার দে। সাবধান, তবলচি রাখিস নে। ওতে তোর বউয়ের অসুবিধে। তবলচিরা জেনার্যালি বখাটে হয়। কেননা ব্যাটাদের থাবা আছে। আঙুল আছে। আর আছে ধপড়ধাঁই।'

তুতুলকে মাউথ-অর্গান কিনে দেওয়া হলো। তারপর সারাক্ষণ ঐ।

তুতুলকে খাওয়াতে হতো না। নিজে-নিজে খেতো। ভাত তার না-হজম। সেরেল্যাক শুধু। মিষ্টির মধ্যে মিষ্টি সুজি। সময় মোতাবিক লিট্টি, আলুসেদ্ধ, মেথিফোড়ন। হেবি পিসিভ্বাস। মাছ উলটে খেতো। তুতুলকে দেখতুম, নংকু মাঝেমধ্যেই খাড়া। 'এতটা হয় কী করে!'

কমল : 'হয়ে যাচ্ছে কী করি বল। হতে নেই বুঝি? ও।'

'না-না,' আমি বোঝাতে চাই,— 'এ হলো আসলি সোনা-চাঁদি কা লক্ষণ। তোর চোথা। গ্রো করতে দে। তারপর আপসেই লাইন চিনে নিতে পারবে।'

লাইন বলতে গবেষণার বাই। এ ব্যাপারে সে কমলেরও বাড়া। সবে যখন একটু হাঁটি-হাঁটি পা-পা হয়েছে, একদিন, কমলের বিয়ের ঘড়িটা গপ করে মুখে পুরে ফেলল। তারপর লালা বা মুখামৃতের যেটুকু কেরদানি, গলে-গলে ঢুকে-ঢুকে, ঘড়ির পেট একদম বুজিয়ে দিল। এতে ঘড়ি অচিরাৎ বেদম হলো বটে, কিন্তু বাছাজীবন তাতে দমল না। নিষ্ঠা চাগাড় পেয়ে বাড়ির আড়াই ফুট আওতার তামাম আসবাব ও খেলনাপাতির দুনিয়ায় সে হয়ে উঠল দস্তুরমতো টেরর। ফলত ট্রয় পিস্তল, ডান্সিং ডল আর কলের বাঁদর থেকে শুরু করে রানী আর কমলের যতগুচ্ছের পেন, ডটপেন, ঘড়ি আর ক্যালকুলেটার এখন ওয়েস্ট-বাক্সে পৃথক সংরক্ষিত। ফি যন্ত্র বাবদ সেপারেট অন্বেষা ও পরীক্ষা, মানে স্ক্রু নাট-বল্টু স্প্রিং লিভার ইত্যাদির অনুপুঙ্খ ব্যবচ্ছেদ ওরফে প্যাথোলজিকাল অ্যানালিসিসের মতো খণ্ড-খণ্ড রিপোর্ট না-পাওয়া অব্দি তার সব্যসাচী-হাত ক্ষিপ্রবেগে। ফলে, আমরা ওর বাড়ি ঢোকার মুখে বা সিঁড়ি ভাঙার সময়েই পেন, ডটপেন, ঘড়ি, আংটি, মোবাইল ইত্যাদি যার যা সঙ্গে থাকে, আগেভাগে লুকিয়ে।

একদিন ঢুকে দেখি, রানীর এক থোলা স্যানিটারি ন্যাপকিন ভুঁয়ে পেড়ে গহন পোস্টমর্টেম চলছে। কমল হাত উলটে বলল, 'কী করব বল! ওর এই রিসার্চের ন্যাক দেখে ভাবছি, নিজের টেনিয়া বানাবো। তোরা কী বলিস?'

বললুম, 'খোস বলেছিস। প্যাঁচ ঘোরাতে ওস্তাদ। পারলে তোর নিজের নাট-বল্টু স্টকে রাখিস। বলা তো যায় না কোনদিন হয়তো তোরই প্যাঁচ ঢিলে করে দিল!'

তুতুলকে নিয়ে বাড়িতে শলা-মুশাবিরা হোক, তুতুল চায় না। সুতরাং সাঁড়াশি নিয়ে এলো, সঙ্গে ধানি লংকা। বলল, 'জেথু, মুত খোলো। তোমাকে থাওয়াবো।'

তো, ঐ পাঁচ দিন বাকি থাকতেই, কিন্ডার গার্টেনের ভেঁপু শুনে মন আনচান করে উঠল তুতুলের। বলল, 'মাম্মা, আমিও ইৎকুলে যাবো।'

তখনও নামের ঠিক নেই। কমল জীবনানন্দে আসক্ত। বলল, 'জীবনানন্দ চক্রবর্তী।'

রানী চড়াৎ করে, ক্ষেপে: 'কী বললে! ঐ শনিচরি নাম সর্বক্ষণ ঘুরঘুর করবে আমার সংসারে? মাগো মাগো। ও নামের কেউ শান্তিতে ভোগে?'

'পাঁচ অক্ষুরে নামে জাদু বড়, তারা বিখ্যাত পরে।' কমল বোঝায়, 'এসব নাম কেউ কাটছাঁট করে না। তিন অক্ষুরে নামের লোকেদের দ্যাখো, কেমন খেলো। পাঁচ-অক্ষুরে গুরুগম্ভীর। ক্লাসিক। তালে তুমিই রাখো।'

'পৌরাণিক চক্রবর্তী।' এতখানি ভাবতে পেরে রানী বলে উঠল।

'বাঃ!' এই প্রথম শুনল কমল। চক্রবর্তী হলে তাকে পৌরাণিক হতেই হয়। 'খাসা।'

ইস্কুলে গেল পৌরাণিক। সে কী কান্না। ওদিকে বাসের হর্ন, এদিকে উৎরোল শুরু। একদিন কমল পিছুপিছু, স্কুটারে। মিস ডেঁটে দেয়,— 'চোরের মতো লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখা দিচ্ছেন কেন? সরুন! সরুন বলছি!'

ইস্কুলের মাঠে একদিন বিস্তর গণ্ডগোল চোখে পড়ে তুতুলের। দেখল, একটা মাদি কুকুর, আর কোমরে লাল ভোজালি-বাঁধা কুক্তাদের ভয়ানক ছয়লাপ। মাদিটা কঁকিয়ে মরে, তবু ছাড়ান নেই। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ করুণ দৃশ্য দেখে যায় তুতুল। শেষে কান্না। কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ি। আতঙ্কে ভরে গেছে ওর মন। মাকে দেখামাত্র ঝাঁপিয়ে পড়ল: 'মাম্মা, তুমি আর বাপির সঙ্গে শোবে না। শোবে না বলো!'

'আশ্চর্য!' কমল সব শুনে বলল, 'এ শালা নির্ঘাৎ আমার পাপের ফল। খুব ছোটবেলা থেকে একটা অবয়বহীন মুখ দেখে আসছি। মুখ নয়, শরীর। ব্যঞ্জনাধর্মী কবিতার মতো। পৌরাণিক ঋষি-প্রবরদের মাতৃকারহস্য খোঁজার মতো। মিথ্যে, শঠতা, ছলনা, ভাঙা শিক্ষা, ভাঙা কালচার, ভাঙা আদর্শ আর ভাঙা বাবা-মা ভাইবোন নিয়ে আমার বেড়ে ওঠার মধ্যে ঐ একটা ব্যাপার ছিল আমার কাছে সত্যি, একেবারে পুরো আর ক্র্যাকলেস। মাঝেমাঝে দেখতুম ঐ শরীর ভাবার মধ্যে একধরনের অদ্ভুত রিলিফ পাচ্ছি। ঐ শরীর, শরীরের জোড়, চুল, নখ, গ্রীবা, নাভি, স্তন। শেষে, তুমি। আমি সারাজীবন একটি-মাত্র শরীর খুঁজেছি, — এই তুমি। ... তা, বেশ। তোমার যা ইচ্ছে করো। আলাদা শোও। আলাদা বিছানা। আলাদা বালিশ। আলাদা স্বপ্ন। আলাদা শরীর। আমাকে আমার শরীর, স্বপ্ন, না-বাঁচা নিয়ে থাকতে দাও। যাও।'

কোয়লার বেওসা করিতে পারি নাই বলিয়া

তা, এইভাবে কমলরা বাঁচছিল। এমন নয় যে তুতুলই ওদের দিনানুদিন সৌমনস্যের আদি ও একবাদ্বিতীয়ম খোরপোশ। আমরা জানতুম, ভায়া-প্রবলেম, বেশ-কিছু তাগড়া চ্যাপারও ওদের জ্যেষ্ঠাশ্রমে। তবে, টাইপ ভিন্ন। যেমন,— এমনও রাত গেছে যখন কামকাজ থামিয়ে ওরা চালের দরদাম নিয়ে ভেবেছে। মানে, রানী হয়তো ঝাঁপি টেনে দিয়ে বলল, 'উফ ভাল্লাগে না আর। চালের দাম কেমন বেড়েই চলেছে দেখেছো!' জবাবে, কমলও হয়তো ওর ককুদ থেকে হাত উইদড্র করে নিতে নিতে বলেছে, 'ডোন্ট ওরি ডার্লিং, ঐ দিনটা এলো বলে, যখন চাল আর চাল থাকবে না। শুধুই ভিটামিন-বি। দু-চামচ গালে ফেলে একগ্লাস জল। ব্যাস।'

গোলাপসুন্দরী চাকরি ছেড়ে দিল।

জীবনের ১২৩ পৃষ্ঠায় যত আমোদ জলকেলি বগল-বাজানো, ১৯৭ পাতায় এসেই সব কেমন বেমালুম হাপিস। রোদ তখন ক্রমে খরতর। ঠিক কোন দিন থেকে খারাপ লাগতে শুরু করে, নথি নেই। তবে, লাগতে যে লেগেছিল, এটা ঠিক। আসলে তালুর মাপ, কোমরের বেল্ট, জুতোর লেস, চিরুনি, ব্লেড, ফেবারিট ফিল্মস্টার— আরও-কিছু বেসিক ডিফারেন্স দু'জনের মধ্যে ছিলই। ছিল যে না, তা বললে ভুল। যেমন, মড়া সেজে কমল একদিন গোলদিঘির পাড়ে। ক'জন সুসাধ রমণীর চোখ পড়ে ওর ওপর। কমল চাইছিল দেখতে, শেষটা। সবকিছুরই শেষ দেখায় ওর খুব লোভ। একফোঁটা তাকায়নি। নড়েনি। শ্বাস অব্দি চাপা। মড়া ভেবে তুলসীবাবুর বাগানে পুঁতে ফেলার তাল হচ্ছে, হঠাৎ কোত্থেকে এক দরবেশ এসে হাজির। বললে, দে, বাছাকে আমার কোলে দে। কমলের প্যান্ট-জুতো খুলে, গুহ্যদেশ উলটে ফকিরবাবার লাগাতার ফুঁ। একটু একটু করে ফুঁ দেয়, আর কী-সব খোতবা। তাইতেই নাকি কমল বেঁচে-বেঁচে, কেঁপে-কেঁপে, জেগে-জেগে উঠতে থাকে। রানী হলে এ-জিনিস কিছুতেই পারত না। পারেনি। পারবে না।

তবে, হ্যাঁ। সেবার কুট্টিমামার শ্রাদ্ধ থেকে বেরিয়ে, আদ্রার পথে, কমলকে একবার জয়চণ্ডী পাহাড়ে তোলার তোড় করেছিল রানী। সত্যবাবুর হীরক রাজার দেশে, হ্যাঁ-হ্যাঁ, পাবলিকের খেয়াল আছে দেখছি! পরপর তিনটে বিশাল মাথা, নেড়া, একটাতে ওরা উঠেছিল। নিচে জনৈক সুবোধ ছাগলের পাশে তুতুল হাঁটুল-মতন বসে আইসক্রিম খাচ্ছে, চাদ্ধারে জঙ্গল। ওপরে চিলেরা চরকিতে মশগুল, মাঝে কোনো চোখ নেই দেখে-ফেলবার। রানীর মাথায় কী দুষ্টুমি খেলল, জানোয়ার প্রিন্টের ব্রেসিয়ারটা খপ করে তুলে, কমলকে বলল, 'এই, এখানটা একটু চুষে দেবে? ভারি টনটন করছে। দেবে?'

কমল শিউরে, 'ইস, ইস, কী করছো? এটা দেবস্থান। পাপ হবে।'

'ধুর্র তোমার দেবস্থানের নিকুচি করেছি। হাঁ করো, হাঁ করো। আমি ভরে দিচ্ছি।'

না। এ-জিনিস কমলের দ্বারাও হতো না। হয়নি কোনদিন।

তাহলে রানীর সঙ্গে কমলের গরমিলগুলো বলি। কমল ভিনিখিচুড়ি ভালোবাসে, সঙ্গে নিমবেগুন কি কাসুন্দি। ধোঁকার ডালনা হলে, বকফুলের চাটনি। কালোজিরের ঝোল ওর না-পছন্দ, কিন্তু কাতলের পেটে চিতল সেঁদিয়ে ভেজে দিলে, তোফা। রানী সেটা রাঁধে না। রানীর ভালো লাগে হ্যামবারগার, লোফ, মার্মালেড। মিল্কশেক লেমোনেড কোকো। আর ভালোবাসে সেমাই চাউমিন, সাপার-শেষে মুগসামলি কি লালমোহন।

গড়নের দিক থেকে কমল একটু খ্যাঁচার দিকে। প্যান্তা। অকাতর লম্বা কমল। তার আঙুল সোজা ও দীর্ঘকায়। বাঁকা না। ন্যুব্জ বা আনত নয় ভারে। রানীর সেটি বেপছন্দ। পুরুষের আঙুল সে চেয়েছিল এক্সট্রা লার্জ, মোটা। সামান্য রিবড ও অরাল। বহুক্ষণ বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে-থাকা হাঁটুর মতো, খানিক বাঁকা। কমলের ওটি নেই, ফলত বিছানায় বাওয়াল।

তুলনায় রানী যথেষ্ট সলিড। বিশেষত কালো ব্রেসিয়ার আর শাদা শায়ায় ওকে মার্ভেলাস স্টাউট লাগে। অথচ ওর সফেদ ব্রেসিয়ারের ভাপানো চুড়োয় কমল এঁকে দিয়েছে নীলসাপ লতা কাউস্লিপ, কতবার। ও পরেনি। রানী পরা ছেড়ে দিয়েছিল আরও কত কী। রানী আর কাঞ্জিভরম পরে না। স্লিভলেসে অরুচি। একদা ফুলহাতা শার্ট পরতো, নাভির ওপর গিঁট। হিপ পকেটে চিরুনি। টেরি বাগিয়ে সিনেমা। আর যায় না। স্যান্ডো গেঞ্জি, সর্টস আর মাত্র মাংকি ক্যাপ শিরে কতবার নাছদোরে বসে বিড়ি ফুঁকেছে। আর ফোঁকে না।

রানীর যা-কিছু ভালো, সবই পাস্ট। কমল বলে, সাজ করো। করে না। বলে, লুঙ্গি পরো। পরে না। নাঙ্গা শোও। শোয় না। একদিন অতীব আশ-যোগে কমল শয্যাগ্রহণ করে দ্যাখে, সরু লাছির মতো একটি না-সর্বস্ব নির্ঘণ্ট ওর তরে গাঁথা। মানে, সে-রাতে যদি কমল খানিক 'আঙুল' করবে বলে আর্জি জানাল, অমনি কাঁচি মেরে দিয়ে রানীর সটান 'না'-এর ঠাপ্পা। ফের অল্প যদি দিল, করতে, পুনরপি কমলেরই ভাষা নকল করে আগেভাগে বলে রাখল, 'নো ঘষাঘষি, একদম করবে না কিন্তু!' কিংবা, 'মুখ দেবে না'। 'উফ, পা তুলতে বারণ করেছি না!' কিংবা, 'উপুড় হবো না'— পাছা কেড়ে নিয়ে চিতিয়ে শুলো,— 'কুকুর কোথাকার!' তারবাদে, বোঁটা। হরেক শুশ্রূষা সেরে কমল যখন স্বল্পমতন কামড় বসিয়ে মূল কসরতে আত্মনিষ্ঠা দাখিল করবে ভাবছে, তার আগেই রানী সামিয়ানা খিঁচে দিল,— 'উঁহু, একদম না।' এবং, সবশেষে, মানে, কমলের যখন হয়ে আসছে অথচ যৎকিঞ্চিৎ আরও উদ্বৃত্ত কুড়িয়ে নেবে মনে করছে, তখুনই হয়তো শুনতে হলো, 'আরে বাবা, হলো তো! আর কতক্ষণ?'

গাদাগুচ্ছের 'না' আর বিস্তর নিষেধাজ্ঞা সহ এক-একটি নিশিযাপন। এতই যদি বাগড়া, ক্রিয়াকর্ম চুকেবুকে গেলে কমল ফি রাতেই কিরা গেলে,— 'কাল থেকে আর চাইব না, যাও, ভাগগো!—'

তত্রাপি, পরের রাতেই কী বাই চাপল, খাতুনের নিপল-দুটো রিঠার মতো কিনা, সেইটে দেখবে। দেখা বিনে লিখতে পারছে না। প্রবল বেগ।

লেখার টেবিল ছেড়ে কলমের ডগা দিয়ে মশারির টোপর তুলে কমল সরাসরি বিছানায় এলো। রানী চিৎবুক শুয়ে। চোখের 'পরে হাত। কমল ওকে নাড়িয়ে-টাড়িয়ে জাগাবার চেষ্টা করল।— 'ইয়ে, বলছিলুম যে, একটু কষ্ট করবে?'

নো রিপলাই।

'রানী, হ্যালো, শুনছো?'

'বলঅ।'

'বিশেষ দরকার। একটু চাদরটা সরাচ্ছি।'

'ক্যানো!'

'একটা জিনিস দেখব।'

রানী চাদর সরাতে দিল মাত্র।

কমল ওর ফ্রন্ট-ওপেন নাইটির সবেমাত্র দুটো ফিতের গিঁট খুলেছে, হাত চেপে ধরল রানী, 'অ্যাই, আজ একদম না!'

'না-না,'— কমল আশ্বস্ত করল, 'শুধু দেখব।'

রানী চুপ মেরে থাকল।

'মিনিট পাঁচের বেশি নেবো না, দেখো।'

'কী দেখবে?'

‘সোপনাট-দুটো দেখব। আরও দুটো গিঁট খুলে দাও না, প্লিজ! খোলো। কী হলো, খোলো! খোলো, খোলো, খোলো! যা ভাগ, খালিপিলি টাইম খোটা করিস না।’— তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে ফের সে ফিরে আসে লেখার টেবিলে।

কতগুলা আলফাল সওয়াল তুই

জনে-জনে জিগাস ক্যানে— হ্যাঁরা ফটকা!

সা-আ-ত বছর। দাম্পত্যের সাত। ঘড়ির কাঁটার টিক-টিক সরে যাওয়া মাত্র নয়। ক্যালেন্ডারের ডেট-বদল নয়, নিছক। কেননা, এই সেই মার্বেল-পয়েন্ট যখন বিরক্তিকর বৈরক্ত আর অতৃপ্তিকর একঘেয়েমির সাঁড়াশিটা নারী-নরের উদবাহিক জীবনকে পিষতে পিষতে পিষতে ক্রমশ এক কোণঠাসা বিন্দুতে এনে হাজির। যার একপাশে হু-হু প্রাণশূন্যতা, আবার অন্যপাশে অথৈ প্রাণচাঞ্চল্য। যখন বোধ বুদ্ধি খুলি বিবেক ভুলে গিয়ে ছটফটানি নামক ব্যাধির কাছে কেবলি নুয়ে পড়ে শরীর। শরীর শরীর শরীর। যেখান থেকে এক নতুন গল্পের গাত্রহরিদ্রা।

তো, কমল যেদিন প্রথম রানীকে জন্ম-পরিচ্ছদে দ্যাখে, সেই সাতবছর আগে, তার মনে হয়েছিল— এই সেই ক্ষৌণিপ্রাচীর আরবসাগর যা থেকে মুখে স্বর্গীয় বিভা আর দেহে উদ্ভিন্ন যৌবন মেখে উঠে এসেছিল সানদ্রো বতিচেল্লির ডিম্ব-অনচ্ছ ভিনাস। ... পরে সেই পোর্সেলিন শরীর বিস্তর ভাঙচুর হয়। যেহেতু কমল চিরকালই ঘোর মারতোল-প্রিয়, এবং, খোদ কন্দর্পদেব তার হাপর ধরে। তারপর, বছরের পর বছর ক্রমাগত মার পেয়ে-পেয়ে-পেয়ে সেই ছিপছিপে তন্বী সদ্যতরুণা ভিনাস, আজ জঁ বাপ্তিস্ত রেগেনোঁর শাঁসেজলে পুরিপুষ্ট তিনকন্যার অন্যতমা।

আসলে, কমল যেটা বুঝছিল, প্রায় নব্বুই শতাংশ দাম্পত্যের অ্যাভারেজ গল্পটা হলো কুতুকমুনির সেই ঊর্বশী-দেহে নারীত্ব ঢোঁড়ার সদৃশ। ... তদনন্তর ঊর্বশী তার সমস্ত আবরণ ও আভরণ খুলে ভূমিতে নিক্ষেপ করলে, কুতুক বললেন, থামলে কেন ঊর্বশী, আরও নির্মোক মোচন করো।

নারদ বললেন, নির্মোক আর কোথায়! সবই তো মোচন করেছে।

কুতুক বললেন, ওই যে, ওর গায়ে একটি পদ্মপলাশতুল্য শুভ্রারক্ত মসৃণ আবরণ?

: আরে, ও তো ওর গায়ের চামড়া।

: ওটাও খুলে ফেলুক। নিচে কী আছে আমি দেখব।

নারদ বললেন, কী আছে তবে শোনো। চর্মের নিচে আছে মেদ, তার নিচে মাংস, তার নিচে কঙ্কাল।

: তার নিচে?

: কিচ্ছু নেই।

কুতুক শোধালেন, তাহলে যা দিয়ে ঊর্বশী পুরুষের বক্ষোমাঝে চিক্ত আত্মহারা করে, সেই নারীত্ব কোথায়?

... কমল চাইছিল, রানী এই গল্প মিথ্যে প্রমাণ করুক।

চাইছিল স্বামী-স্ত্রী নির্ভর ক্লান্তিকর একঘেয়েমির দীর্ঘ অবসাদ থেকে সমূহ মুক্তি। চাইছিল যৌনতার সেই খেই-হারানো জোর বাতাস। চাইছিল দাম্পত্য-যৌন-প্রণয়ের হাতছুট বৈঠা। চাইছিল জন্মেজয়ের অনার্য-তৃষা। চাইছিল হঠাৎ-খুলে-যাওয়া স্লুইস ফুঁড়ে ধেয়ে আসা সুবিশাল মহোর্মির লেলিহান তোড়। চাইছিল ...

... তবু তবু তবু, কমল দেখল, তার খাঁই-আব্দার বা বেলেল্লাপনার কোনো ঝোলই রানী আর টানতে পারছে না। রানী আদুল গায়ে আর আসে না বহুরাত হলো। আবাসা শুয়েছে সে এক যুগ আগের স্মৃতি। গেল ডিসেম্বরে সেই যে চাদর জড়ালো, আর সরায় না। মায় নায়লনের মোজা। পারলে গ্লাভস পরে শোয়। কমলকে গ্যাস বা হিটারে হাত সেঁকে উঠতে হয়েছে কতবার, তালুর ছ্যাঁক রানীর অসহ্য। তারপর হুক, গিঁট, ভজনা ... উফ, অকরাদিক্রম প্রতিরোধ। রানীর দাঁত-কিড়মিড়ে 'উঃ' 'আঃ' 'আহ' 'হলো?' 'আর

কতক্ষণ?’ ইত্যাদি কমলকে রণশয্যা ত্যেগে উঠে আসতে বাধ্য করেছে কত রাত! অযথা কথা কাটাকাটি, খিচখিচ। মজা বন্ধ। কাজ বন্ধ। লে-আউট। লে-অফ। কালো ঝান্ডা। রিরংসাহীন রাতগুলি নির্বিকার বহে যায় শুধু। ...

এহেন ঢোলতা দিনে ব্রাশ ও ইজেল হাতে ঐ সাত। খেইহীন এন্ট্রি। সে এলোও খুব সাবলীল ক্রমে। বাঁকা-ঠোঁট সিগারেটেরে রিং উড়িয়ে। ক্ষুরের শব্দ তুলে। আর স্ট্রাইড গুনে গুনে। কমল এবার চাইলো ঐ ক্ষুরধ্বনি নিজের কানে শুনবে। তার প্রবেশপথ করে তুলবে মসৃণ ও স্বচ্ছন্দময়। এবং তোরণ খুলে ধরবে। এবং কুরনিশ জানাবে। এবং, সু-স্বাগতম।

ওরা নিজে-নিজে একটা খেলা চালু করেছিল। যদিও খেলাটার উদ্ভাবক ছিল কমল, কিন্তু খেলেছিল বেশি রানী।

একদিন পাহাড় জঙ্গল বাজার মেলা খুব করে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরল দু’জনা।

রাতে শুতে আসার আগে রানী জিগ্যেস করল, ‘আজ কি একটু স্কচ খেয়ে শোবে সোনামণি?’

‘কেন বলো-তো ডার্লিং?’ সিগারেটের ছাই ঝেড়ে কমল তাকাল।

‘না, এমনি। অনেকদিন পর একটা কাপল দেখলে কিনা ...’

‘ওরে দুষ্টুবুড়ি, তুমিও দেখেছো তালে!’ শেষ টানটা মেরে সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে কমল আথিবিথি রানীর চোখের দিকে: ‘এখন তো ওদেরই সিজন। চাদ্দিকে দেখছো না ঢপাঢপ কেমন বিয়ে হচ্ছে! ওরা গজাচ্ছে, আর আমরা মুড়োচ্ছি। মেয়েটাকে দেখলে? যেমন ফেয়ার কমপ্লেকশান, তেমনি অ্যাপিটাইজিং ফিগার, আর তেমনি—’

‘ইস! তুমি তাহলে কিছুই দ্যাখোনি। ছেলেটা? যেমন টল ফিগার, তেমনি স্মার্ট। বাঁকা হয়ে দাঁড়ানো, মুখে সিগারেট। ওঃ! আমি তখন দেখব কী—’ শাড়ি-মাত্র খুলে শুধু ব্লাউজ আর শায়ায় মশারির মধ্যে টুক করে ঢুকে, রানী,— ‘দেখি যে, ছেলেটা কেমন, ঐ তুমি যাকে বলো, চোখের মধ্যে চোখ ঢেলে, মেয়েটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। উফ, ভাবাই যায় না। তাতেই বুঝলাম, জাস্ট ম্যারেড।’

জাগো। শালী, ওই তোমার চোখ জাগছে। তুমিও জাগো। তুতুলকে ডিঙিয়ে ব্লাউজের ওপর থেকে রানীর বর্তুল গম্বুজে হালকা টোকা মেরে কমল বলল, ‘সত্যি, মনের বাঁদরী কখন কিভাবে যে লেজ তুলবে আগে থেকে জানবার যো নেই। এই যে অ্যাদ্দিন বাদে, তুমি, এভাবে, তা, কতদিন পর বলো তো?’

‘আমি তো শুধু ছেলেটাকে ভাবছি। তুমি পারবে, ওরম?’ বলে আইবল তুলে রানী অ্যাইসা বিভ্রম রচনা করল, যার হদিশ কমল-ডিক্সনারিতে নেই। আর তাইতেই সে এগিয়ে না-এসে পারে না, এবং তার আদরণীয় বাতাপি-দুটিকে থাবার মধ্যে পেয়ে: ‘এই প্লিজ, আজ খুব ইচ্ছে করছে। তুমি কতদিন দাওনি। প্লিইজ ...’

‘উফ, ফের শুরু হলো তোমার। কী ভাল্লাগছিল ছেলেটাকে ভাবতে!’ রানীও একটু দাঁও খেলল, আর, নড়েচড়ে পাশে জায়গা করে দিল, কমলের।

‘কতদিন পর তো বলছি।’ পাশে সেঁদিয়ে, কমল : ‘দিচ্ছো তো?’

‘আরে! কালই যে হলো?’ রানী সত্যিই খুব অবাক।

‘আরে ওটা তো গতমাসের একটা এরিয়ার পেমেন্ট দিলে।’ কমল মর্দন জারি রেখে বলল, ‘আজ কিন্তু ফ্রেশভাবে নেবো। অন্যভাবে।’

‘দিনকে-দিন তোমার খাঁই কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে।’

‘আজকের পর দশদিন আর বলবো না, দেখো।’ কমল বলল, ‘আসলে, আজ সন্ধে থেকে হেবি প্রেসার পাচ্ছি। প্লিইজ, বেশ ভালো করে দিও কিন্তু!’ ... বলতে বলতে একদম কেলিয়ে পড়ে সে, নেতিয়ে।

হ্যাঁ তো মেয়েরা বলে না। রানীও চুপ মেরে মজা গিলল।

'চলো, এদিকে ঘোরো।'

'একটা শর্তে।' ... রানী ওর চুলের, থুড়ি, কানের ঝোঁটা তুলে কমলের মুখটা নিজের মুখের ওপর লটকে দিয়ে, তদুপরি ঈষৎ কামনা ও বিভ্রম রচনা করে, এবং নাকের পাটায় বেশর-প্রতিম এক কণা ঘাম প্রসব করে মোলায়েম গলায় বলল, 'ঐ ছেলেটার মতো তাকাতে পারবে, আমার চোখে চোখ ঢেলে? তাহলে পাবে।'

'কেয়া মতলব!' কমলের হাত তোল্লাই বুঝে এরই মধ্যে দুটো হুক খুলে দিতে পেরেছে— 'পারবো না বলছো!'

'পারবে?' রানী তার বিখ্যাত গস্তানি চোখ ঝিঁকিয়ে। তার শান্ত শীতল শরীর বহুদিন পর হঠাৎ কেমন উষ্ণ-চাঞ্চল্যে নাড়ান দিয়ে উঠেছে যেন। ঠাহর করে, কমল তার শায়ার ফাঁসও ঈষৎ আলগা করে দিল। এখন রানীর হাঁটু থেকে জঘন, জঘন থেকে নাভি, নাভি ও নিতম্বের উতলা ঢেউয়ের চারপাশে, দেহের থরে-বিথরে থাবা হয়ে ঘুরে বেড়াবার অবাধ অভয়ারণ্য। কমল ওকে কুমোরের মতো দু-পাশ থেকে সাপটে ধরে বলে, 'এসো আজ তবে ঐভাবে আদর খাও তুমি। ছেলেটাকে গড়ো। চোখ বুজে শুধু গড়বার চেষ্টা করো মুখটা। আজ রাতে তুমি ঐ ছেলেটার সঙ্গে শুয়েছো মনে করো, এই হাত আমার না, ঐ টল-ফিগার ছেলেটার। এই শরীর, শরীরের ভার, শরীরের সবকিছু ঐ স্মার্ট বয়ের।'

'আহ'— রানী তার সর্বাঙ্গ বিছিয়ে আঁকড়ে ধরল তার পুরুষকে।

আ, কতদিন পর প্রথমরিপুর ঘটাবহুল শোভাযাত্রা! আমি পেয়েছি— কমল ভাবল, সবাই যা পায় না, আত্মাবলুপ্তির আগেই তা আমি ফিরে পেয়েছি। থ্যাংক্স যীশাস। এই খেল জোমবে। আমি গ্রান্টি দিয়ে বলছি, হেবি জোমবে। একে বেস করে পোস্ট- বিবাহযুগের উত্তপ্ত অধীর মাসুম রাতগুলো বারদিগর ফিরে আসবে না? আলবাৎ আসবে। চালু করে দ্যাখো, শরীর ছুটে এসে বলবে, আমাকে নাও। আমি খেলব। বলবে না?

জমল। কিন্তু দু-চার রাত। তারপরেই ফের পচ ধরা শুরু।

রানী বলল, 'ধ্যাৎ, মুখটা ভালনা। চোয়াড়ে মার্কা। ছাড়ো, বাদ দাও।'

কমল ভেরড়ে গিয়ে বলল, 'না-না, সে কী! খেলা যখন স্টার্ট হয়েছে, পিচ ছেড়ো না প্লিইজ। তুমি বরং বসাকের মুখটা ভাবো।'

'ধুর্র।' রানী খুব জ্যান্ত থেকে জবাব দেয়, 'গোমড়া-পারা। গোমসা। রগড় বোঝে না।'

'তালে নুনু ভাবো।' কমল মুখ নামায়।

'গোঁফ নেই। চোয়াল ছেঁচা।' রানী ঠোঁট সরায়।

'মদনা?'

'ম্যাগো! পেঁয়াজ খায়।' এক মগ বমিই যেন উগরে দেবে রানী।

'মহা মুশকিল।' কমল চিন্তায় পড়ল। 'তাহলে কাকে ডাকি বলো তো! ভচি চলবে?'

'কনজারভেটিভ। ব্যাটে-বলে পারবে না।'

'উফ। বিল্লু তবে?'

'প্যাংলা, ডিগডিগে।'

'ডিগডিগে হলে কি, দারুণ প্রিহেনসিল। গ্যাঁদার মালা টেঙে দাও, ঠিক তুলে নেবে।'

এরবাদে থাকে শুধু বাবর। কমল ভাবল, নাঃ, থাক। ও মাকড়ার থোবড়া মানেই আসশেওড়ার জমঘট। তাচ্চে শারুখ কি সালমানের প্রক্সি দিই, তাতে বরং ফতে হবার চান্স।

শেষে অবস্থাটা দাঁড়াল এই, যে, বিছানায় লগ্ন হবার পর সানি-সালমান- গোলগোবিন্দা না হলে ওদের চলে না। ইভন, উকিল শ্যামকিশোর রাউত। চাঁদসিখানার ডাক্তারবাবু জলসাবরণ পাড়ুই। ভাটিখানার কালু

দাদা। পাড়ার উঠতি রংদার পিল্লা সাও। জেলেপাড়ার শিবরাম ধীবর। বাবা শ্রীশ্রী ১০৮। স্বামী রামদেব। কে আসেনি? একদিন ছাদ ফুঁড়ে বিগ বচ্চনকেও নেমে আসতে হয় মশারির ভেতর। সরোদের ছড় হাতে আমজাদ আলি। বাঁয়া সহ জাকির হুসেন।

এ-বাদে, এনডিয়রমেন্টের হাতনুড়কুৎ হিসেবে কিছু কাঁচা খিস্তি, যেগুলো কমলের কল্লায় হরদম লকলক করে, তারও সাযুজ্য ইস্তেমাল চলতে থাকে।

তবু কিছু হচ্ছে না, কমল বেশ বুঝতে পারছিল। কল্পনায়-গড়া পরপুরুষের উত্থিত পুরুষা। হোক, কিংবা তাজা ছাল-তোলা রগরগে স্ল্যাং, অল্প-কিছু বাসি বা পুরনো হলেই জোলো আর অকেজো হয়ে এক্কেবারে নেতিয়ে পড়ে। সুতরাং, মাস-দেড়েকের মধ্যেই পুনরায় খর্খরে হয়ে পড়ল রানীর সিংহদ্বার। তখন কারো ঢোকাতেই কাজ হচ্ছে না কোনো। রানী বলল, 'অনেক হলো। ডাকো এবার বাবারকে। তুমি দেখছি ডাকতেই ভুলে গেছো, ওকে! কী, পারবে না?'

'ছিঃ।' কমল খপ করে ওর গাল টিপে দিয়ে বলল, 'আমাকে নভিশ মাতাল ভাবলে? তোমাকে দেখি, মাপি, মারি, খাই বটে, কিন্তু তাজ্জন্যে নিজের বউকে নিজের একার মাল ভেবে নিজেকে এস্ট্যাবলিশড ভাবার মতো লোক অ্যাড়া চক্কোত্তি নয়। আমার ভাবটা হলো, অনেকটা সেই বাউলতত্ত্বের মতো। বুঝলে,' — কমল নেতানো ঘোড়াটাকে পাজামায় ফিরিয়ে এনে বলল, 'একদিন ঠিক করলুম হেঁটে বেন্দাবন যাবো। ঠাকুর চৈতন্য গেছিলেন, কাঁটা সেই পথ ধরে। সেইমতো স্টার্ট। পাহাড় জঙ্গল নদী নালা পেরিয়ে শেষে মুরারডি অব্দি পৌঁচেছি, হঠাৎ হাত চেপে ধরল মাথাপাগল এক বৃদ্ধ বাউল: ঠাকুর, তুমি বাড়ি ফেরো। ফিরে সর্বস্বান্ত হও। নিজেকে বিলিয়ে দাও। নিজের সবকিছু। ঐ তোমার মুক্তি। ... আমি বললুম, বাউল বাবা, আমার নিজের বলতে তো, ঐ একটি মাত্র বউ। তাকেও? পালমশাই বললেন, হ্যাঁ, তাকেও। নারী-পুরুষের সম্পর্ক তো একটাই। যৌন-সম্পর্ক। এটাই প্রাকৃতিক সম্পর্ক। যা প্রাকৃতিক, তাই ধর্ম। তাই সত্য। এর ভালো-খারাপ ন্যায়-অন্যায় হয় না। মানুষ ছাড়া আর-সব প্রাণী এই নিয়ম মেনে চলে। একমাত্র মানুষই নারী-পুরুষের ধর্মীয় আর সামাজিক সম্পর্ক ধরে রেখেছে। নারী-পুরুষ, বিবাহ, দাম্পত্য, এসব বানানো সম্পর্ক। মিথ্যে সম্পর্ক। ভুল সম্পর্ক। যেহেতু ধর্ম ও সামাজিক সম্পর্ক মানুষের বানানো, তাতে ভুলভ্রান্তি সম্ভব। তুমি এই ভুল ভেঙে দাও। ... ব্যাপারটা বোঝো, আমরা শুধু-শুধু বাউলগুলোকে ভোলামন আত্মভোলা উদাসী ভাবোন্মাদ এসব-টেসব ভেবে ভুল করি। তুমি চাইলেই, পারো। টু টু জিরো টু এইট নাইনে একটা ডায়াল করে দ্যাখো। বলবে, যাই গ।'

নাথুনিয়া হায় রাম বড়া দুখ দিনা

জীবনের মতো রগড় আর জানে কে! পেছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে লম্বা করিডর পেরিয়ে সে হঠাৎ লিফটের মুখে এসে দাঁড়ায়।

গত আড়াই মাস ধরে কমল যে লিখতে পারছিল না, লেখা ভুলে গিয়ে মনে হচ্ছিল সব কেমন থম মেরে, বয়ে যাওয়া জলস্রোতের মাঝে শিবলিঙ্গের মতো সে নিজেও যেমন নিজের কাছে একক উপমা হয়ে, সময় আর চারপাশ আবদ্ধ ও স্তিতধী এবং বাইরের কেউ, কোনো-কিছুই আর ঢুকবে না মনে-মনে একরকম মেনেই নিয়েছিল সে— সেখানে, তার সবকিছুই আজ খোলামেলা, উন্মুক্ত, সুতরাং উজ্জ্বল। সতর্কভাবে না হলেও, অজান্তে, নির্জ্ঞানেই হঠাৎ তার মনে হলো সুইংডোর টেনে ধরে স-কুরনিশ মৃদু হেসে স্বয়ং জীবনদ্বারীই তাকে বলছে, ওয়েলকাম স্যার!

কোথাও কিছু নেই, সরসরিয়ে জেগে উঠল উপন্যাস লেখার কুড়কুড়ি।

'মাইরি, একটা কথা কী জানিস' দ্বিতীয় পেগের শেষ ঢোঁকটা গলায় ঢেলে প্রথম যে-কনফেশনটা সে দেয়: 'খুব ছোট থেকে একজন পুরুষ তার যৌন-অহংকার নিয়ে তিল-তিল করে গড়ে ওঠে, স্রেফ, একজন নারীকে জয় করবে বলে। কিন্তু আমি কী পেলুম, বল! একটা-মাত্র রানী, তারও তল পেলুম না। কী যে চায়, মেয়েটা! মহা ধাঁধা। একেক সময় মনে হয়, ভুগছে। একটাও কথা নেই। বলে না। পরে হয়ত দুম করে বলে উঠল, তুমি আজ চুপচাপ যে বড়! ওফ, টস করেও বোঝা দায় এই মেয়ে-জাতটা।'

লালপানির রসায়ন তার শব্দসজ্জাকে উদ্বেলিত করে থাকতে পারে। তথাচ, এই ছিল তার স্ব-পরামৃষ্ট ও সুযোজিত এপিলোগ। মূলত।

কমল এমনিই। গুরত্বের কিছু বলবে বলে, বলতে বসেই, দেখেছি, দুম করে শুরু, কোথায় লেজ কোনঠিনে মুড়ো হদিশ মেলে না। বললুম, 'ছাড়। গেলাস-হাতে এসব ভাল্লাগে না। লেখা শুরু করেছিস নাকি, সেইটে শোনা।'

'নাঃ। ভেবে দেখলুম, লিখে-টিখেও যদি বেঁচে থাকা যায়। এই মনে করে আর-কি।' গড়গড় করে আরও পোয়া গ্লাস ঢেলে, ছিপি এঁটে সরিয়ে বোতলটা, বলল, 'এই বোতলটা যেমন, খালি হয়ে আসছে রানীর নেশা। কি করে বাঁচবো বল। তাই লেখা। লেখার মধ্যে বাঁচা। কিন্তু লিখি কী? কী লিখলে বাঁচা সম্ভব, সেটাই তো জানা নেই। মানুষ শালা লেখেই বা কেন, তুই জানিস?'

'লেখালেখি তো একটা ক্রাইম।' আমি বললুম, 'শালা ভাত-রুটিকেও তোরা শব্দ বলে চালিয়ে দিস। জীবন থেকে পালিয়ে শব্দের বাদাড়ে ঘোরাঘুরি। এ অপরাধ নয় তো কী?'

'হেবি কথা।' কমলের মুখ হুটসে মুগ্ধ হতে গিয়ে পরক্ষণে নিভে এলো, 'সত্যি, যে দেশে হোলটাইমার বেশ্যা, এঞ্জিনিয়ার, রাজমিস্ত্রি, মুটে, ভিকিরি আর চাঁদসির ডাক্তার পাওয়া যায় অথচ লেখক একজনও না, সে-দেশে লেখালেখি করাটা তো একটা অপরাধই। ঠিক বলেছিস।'

'না না, ওদের দেশেও,'— আমি হাত নাড়া বাবদ বলি, 'কথাটা কে বলেছে, জানিস?'

কমল মুখ ছুঁচলো আর ভুরু ছুঁড়ে তাকালো।

'জর্জ বাতাই।'

'ঠিক বলছিস? পড়েছিস তুই? অবশ্য,'— কমল ভুরু নামিয়ে নিতে নিতে বলল, 'অবশ্য বাতাই না বললেও, এটা আমার অনেক দিনের থিসিস। জীবন থেকে ভেগে শব্দের ঘাঘরায় গোলচক্কর। ওহ। কিন্তু ... কিন্তু, এই গোলচক্কর ছাড়াও যে আমার চলবে না, বাবর! আমি যে শব্দ খাই শব্দ মাখি শব্দ ঘুমোই শব্দ চুদি,

— শেষমেস শব্দ দিয়েই তো তোরা জ্বালাবি আমার চিতা, না কী! ওতেই আমার প্রদাহ প্রজ্বলন আর বেঁচে-থাকা।'

আমার তখনও চড়তে বাকি। ওর দিকে তাকাই। ও কি এবার কাঁদতে বসবে? কেঁদে নেবে একটু? কেঁদে উঠবে? বললুম, 'বেশ তো। এটা নিয়েই লেখ। এই বাঁচতে পারছিস না, এটা নিয়ে। আমাকেও দে আধপেগ।'

'বেড়ে বলেছিস।' এফ-ডি ভেঙে ব্যাংকের টাকা তোলার মতো কষ্টের হাসি হেসে কমল : 'যাকে-যাকে পেলুম না, জীবনে, তাকে-তাকে নিয়ে গল্প। এই যেমন নিজেকে নিয়ে, এক্সক্লুসিভলি। একটা মনের মতো কাজ, কি বলিস?'

'বলছিই তো।' বললুম, 'একটা বেবুন রাখিস, পারলে। ওকে নানা পোজ আর পোজিশনে নাচাবি। সাবধান, ওকে নাই দিবি না। বা, তোল্লাই। ওর ল্যাজ আছে। তুলেই চোঁ-চোঁ। কম করে ঢাল। মাল তো কম দেখছি।'

'তুই খাবি তো বল আরও মাঙাচ্ছি।' কমল ঢালে আর ঢেলে চলে— 'এইজন্যেই তোর সঙ্গে গেলা। কেমন সুড়সুড় করে প্লট বেরিয়ে আসছে দ্যাখ। শালাহ! জ্বান্ত পাঁঠা তুই একটা। উল্লুক। মোষ। গর্দভ। বাপ্পোৎ, মাদামাদির গল্পে বাঁদর আসে কোত্থেকে?'

'না, মানে, আমরা তো সব এক-একটা মর্কট, তাই ...' আমি তোতলাই, 'আসে না বুঝি? ও।'— এই প্রথম কমলকে একটু টাইট দিতে পেরে ভেতরে-ভেতরে আমি চনমনে। কিন্তু প্রকাশ্যে সোৎকণ্ঠ বজায় রেখে — 'কিন্তু অ্যাড়া, তুই যে বলেছিলি বধার্থ মৃন্ময়ীকে চানাতে নিয়ে গেলে গোটা নরনারী-প্রথাটাই বাংলা সাহিত্য থেকে লোপাট? তালে, এখানে কেন?'

ভিনি-ভিডি চোখে তাকায় কমল। বহুক্ষণ পর, ফার্স্ট অফ দ্য ডে, হাসির ছলে সামান্য একটু কচি দোল, ওর ঠোঁটে। বলল, 'ঠিক ধরেছিস। তেমনি একটা শুরু করেছি আর-কি। তোদের জন্য। খুব অ্যাটাকিং স্টোরি। শিং আছে। গুঁতোবে, দেখিস। দাঁতও আছে। আর বিষ। একফোঁটা চাখলেই রিয়্যাকশান শুরু।'

আমার এতক্ষণে ধরতে লেগেছে। বলি, 'সাবজেক্টটা কী? হোঁদড়ের রিভেঞ্জ সেন্স! নাকি ছাগল কেন গুঁতোয়!'

'ধ্যুস। ওসব কবেই রিজাইন দিয়েছি।'

'তাইলে, লিঙ্গের সাগরযাত্রা ও নারীর কাপালিক চেতনা। ঠিক কিনা?'

'থই পেয়েছিস মনে হচ্ছে। বলে যা।'

'তো, যোনির কালনৃত্যই হবে। ভগকুণ্ডলা। ও হো হো হো—'

'ধেক্তেরি!'— কমল ক্ষেপেই গেল একচোট, 'তোর দেখছি হাগতে-বসে পেচ্ছাপ পায়। আমি কি ন্যালাখ্যাপা বাওরা জটাধারী কবি যে যোনির পাপড়ি চিরে জ্বান্ত ভিমরুল নিক্ষেপ গোছের পদ্যপটল ব্যাওড়া লিখব। বলছি নারী-নারকী কেস। আর তুই কিনা—'

'কনজুগাল কনকাশন ইন দ্য সেভেনথ ইয়ার—?'

'এক্কেবারে ঘাটে এনে ঠেকালি নাও।' কমল হেবি খুশ— 'নে, আরেক পেগ মার।' ফনা নামিয়ে আবার হালা-মুড়ে ফিরে এলো সে,— 'কিন্তু কনজুগাল কনকাশন তো নয়, ইংরিজিতে ওকে বলে সেভেন ইয়ার ইচ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, মুড়ি ডোলানো দেখেই বুঝেছি, তোর স্মরণশক্তি জিন্দাবাদ। সাবজেক্টটা নিয়ে মেরিলিন মনরোর একটা ফিল্ম আছে। কিন্তু আমি লিখছি একটু হেলে, এমন, যা বাংলায় কেউ লেখেনি। আগে বল, ককপিটে কে থাকছে। গেস, হু।'

'কে আবার। ক্ষেপু চক্করবর্তি—'

'বেঁচে থাকো বাওয়া। মুকে ফুলচন্দন পড়ুক।

'আর রানী?'

'আলবাৎ। আসল দিব্যরথ তো ও-ই। অ্যাস্ট্রনট হবি তুই। বাবর, তোকে আমরা মহাকাশ দেখাব। দেখেছিস কখনো? এই তিন চরিত্র নিয়ে কমলের পাপ। কী, জমবে না বলছিস?' কমল একটু থেমে, ঢক করে মেরে ফেলল খানিকটা। তারপর : 'মূল চরিত্র যখন, বেনামে আসা ঠিক হবে না। আমি তো লুকোছাপায় নেই, তোরা জানিস। এছাড়া বসাক মদনা নুনা ভচি বিল্লু থাকছে, ওরাও বেনামী হবে না। এরবাদে আরও কে-কে থাকবে, এটা সাসপেন্স।' মুঠোর ঢেউয়ে মা-গা-রে-সা বাজাতে বাজাতে কমল বলল, 'ভাবতে পারিস! কী থ্রিল! আমারটা তো এখন থেকেই কাঁটা খাচ্ছে, দ্যাখ দ্যাখ' প্যান্টের জিপ ফাসনারে হাত রাখল সে।

এই রে, অ্যাড়া খেপেচে। অনেকদিন বাদে আঙুরের বেটির সোহাগ পেলে যা। এখন কোন সীনটা দেবে খোদায় মালুম। গেলবারের শেরে-পাঞ্জাবে সর্দারজির পেঁয়াজ-ছোলা চাকু-হাতে তাড়া করার সীনটা এখনও গ্রীন-ফ্রেশ। সেটা মনে পড়তেই, আগেভাগে খপ করে হাতটা চেপে বললুম, 'অ্যাড়া, নো সীন প্লিজ। করিস না।'

কমল বলল, 'যাক, তুই যখন বলছিস, ছেড়ে দিচ্ছি। পুরুষ সেলফিশ জিন কিনা। চার কোটি জিনের ছুঁচ সর্বক্ষণ রক্তে। বড় হিমসিমে ব্যাপার, এই সামলানোটা।'

'কিন্তু গুরু,'— আমি জড়ানো গলায় বলি, 'কমল রানী বসাক মদনা ঠিক আছে। বাবর কেন? এই ভাঙা কুলোটাকে না রাখলেই নয়? তোর নভেলে ছাই কি খুব বেশি?'

'ছাই কী বলছিস রে অগা!' কমল বোতলসুদ্দু হাত তুলে : 'আগুন। ইয়া লকলকে। শাড়ি শায়া ব্রা প্যান্টি থুপি সব পুড়ে ছারখার।'

'ওইজন্যেই তো ভয়। তোর আগুন মানে তো সেই পঞ্চবাণের ফিল্ড-আর্চারি। একটু লাই দিলেই স্তন যোনি লি। সব লটলট করে ঝরতে থাকে। তোর দিদু বেঁচে থাকলে কী বলত জানিস! বলতো, বাবা এড়ু, লোচ্চামো করে জম্মকালটা শুদুশুদু মাটি কল্লি তুই! নিজে তো গেলিই, কলমডারেও ভাগী কল্লি পাপের?'

কমল তখুনি কিছু বলল না। হুট করে উঠে দাঁড়াল, একবার কটমট করে তাকাল আমার দিকে। কিছু বলতে গিয়েও বলল না। তারপর মদের পেগ হাতে চলল টয়লেটের দিকে। বাঁড়া ধোবে নাকি রে বাবা! আমি চাপা গলায় চেঁচিয়ে বললাম, 'অ্যাড়া, কচ্চিস কী? সর্দারজি দেকতে-পেলে ক্যালাবে।'

তবু কিছু বলল না।

রীতিমত ফিনিশ করেই ফিরল। ফিরে, তারপর বলতে শুরু করল।

'এই জন্যেই, এই জন্যেই জাতটা শালা একশো বছরেও মাদা না হয়ে পুরো নওল থেকে গেল।— শালা, বাংলা বইয়ে কাজ শুরু হতেই আলো নিভে যায়। তখন হয় শুধু ঝড়ের তোড়ে পাল্লার দাতকপাটি, নয়তো বয়লারের ঢাকনি খুলে লে-খচাখচ কয়লা। তোরা দোগলারা শালা এতো যৌনাতঙ্কে ভুগিস কেন বলতো? যৌন কি জীবনের বাইরে কিছু! নাকি, সিফিলিটিক?'

আমি চুপ মেরে বসে কমলকে দেখি। ওকে খচাতে পারায় সুখ। দাঁত গিজুড়ে হাসি। 'শালা দোগলার ব্যাটা চোগলা!'— সে তখনও গজগজ করছে। একটা আধভাঙা বিড়ি, পকেট থেকে বের করে ঠোঁটের ডগায় ধরে। ফস করে দেশলাই জালে। কমলীয় কায়দায় অবশিষ্ট কাঠিটুকুর আগুন ফুঁ দিয়ে নেভায় ও অ্যাসট্রেতে ফ্যালে। তারপর ঠোঁট বেঁকিয়ে আমার কানের পাশে ধোঁয়া ছেড়ে : 'তোদের মতো দোগলার জীবনে ঢুকেও, জীবনকে জানতে হেবি ভয়। বই পড়ে, তত্ত্ব পড়ে, তবে জীবনকে জানা অনেক নিরাপদ। এই মনে করিস তো তোরা! মোটামুটি এটা আঁচ করেই, কমলের পাপ। জীবনে প্রবিষ্ঠ না হয়েও জীবনকে প্রবিষ্ঠ হতে লোভ দেখাবে এ। আমি চাই তোর মতো এক-একটা হিপোক্রেট ফি দুপুরে ভাত খাওয়ার পর আমার একটা-করে পাতা পড়ুক, আর নিজে-নিজে অ্যাফ্রোন্টেড হোক, আর হিউমিলিটেড। হিপোক্রেসি থেকে উদ্ধারের এরচে তাগড়া দাওয়াই আর নেই। চড়াৎ করে মুখোমুখি চড় না খেলে তোদের দোগলাপনাও ঘুচবে না। যা, ভাগ!'

বিড়ির আরেকটা ফুঁকই সে ফোঁকে। তারপর বুড়ো আর তর্জনী থেকে খুলে, টুসকি। তারপর পাবের মস্ত ঘড়ি দেখে নিজেরটার কাঁটা ঘোরায়। তারপর চপ্পলে পা ভরে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। তারপর অলিভার টুইস্টের সেই ক্যারেক্টারটা। হুপ করে অন্ধকারে স্লিক।

আমি তখনও ঐ পোজে, বসে। নির্মীয়মান উপন্যাসের তত্ত্ববাহী ক্যারেক্টার হয়ে।

রানী ইয়োকাস্তে একই চান্সে রাজা অয়দিপাউসের বউ প্লাস মা (গো!)

নারী, একটি হিংসাত্মক ও নাশকতামূলক শিল্প।

.... রঁদার ভাবুক-মুদ্রায় অনেকক্ষণ নীরব-নিশ্চল বসে থাকার পর এই শব্দ ক'টা সে লিখল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তার কেন-জানি মনে হলো, দিনের অন্তিম বেজার দৃষ্টিখানি অবক্ষেপ করে রানী গোটা-রাত-নারী থেকে ট্রিপল জাম্প করে হঠাৎই পাশ ফিরে শুলো। সে এখন পড়ে-পড়ে ঘুউম মারবে, শুধু।

নারী মৃত্যুর বিজ্ঞান। ডেথোলজি।

আচ্ছা, এ নারী কী? এ দিনে এক, রাতে আরেক। এ নারীকে আমি চিনি না।

পরিচিত দায়রায় যথেচ্ছ-নারীর কাছে কোনকালেই কোনো যাচনা ছিল না আমার। আমি এমন কোনো নারী খুঁজিনি যে শুধু ঘুমোতে আগ্রহী বা গামলা-ভরা খাদ্যে। নারীকে নারীর মুখ বা নারীর চোখ মাত্র আলাদা করে চাইনি, কেবলি। চেয়েছি টরসো মূর্ধা সৃক্ক নোলা কল্লা সিনা রাং নিতম্ব পয়োধর নাভি যোনি নবদ্বার সম্বলিত একটি পূর্ণাবয়ব নারী, যাকে স্পর্শ মাত্রের লহমা থেকে শব্দের স্রোত ধেয়ে আসবে বেবাক এবং প্রতিরোধহীন। স্ব-পরিচয়হীনা, জন্মহীনা, ইতিহাসহীনা, নিয়তিহীনা সেরকম কোনও নারী আজও আমার উপজ্ঞার বাইরে রয়ে গেছে ...

দ্য বেস্ট রিলেশান বিটুইন আ ম্যান অ্যান্ড আ উওম্যান ইজ দ্যাট অফ দ্য মার্ডারার অ্যান্ড দ্য মার্ডারড। ... ফিয়োদোর দস্তয়েভস্কি-হাতে নিমীলিত মাথায় নারী-চারিত্র্যবিজ্ঞানে মনোনিবেশ করতে গিয়ে রানী সংক্রান্ত গভীরতম সমস্যাটিই কমলের কাছে জলবৎ সাফ হয়ে আসে :

নারী পুরুষকে হালাল করবে, তার আগেই নারী বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত-সব বাহারী শব্দঘোঁটের বিছেহার জোর করে লাথিয়ে ভেঙে ফেলা দরকার যদ্দারা উদঘাটিত হবে নারীর মৌল স্বরূপ। নারীর বেমুখোশ চেহারা।

... এ পর্যন্ত লিখে সে থামে। সিটিজেনের গোল ঘড়িতে বৃক্তাকার রাত। আর পারে না। কিছুক্ষণ নদী আঁকে। কিছু সরীসৃপ। একটা সিগারেট খায়। জল, একগ্লাস। ক্ষুদে পেচ্ছাপ। ইত্যাদি আরও-কিছু। কিন্তু লিখতে, সে, পারে না। কেননা সে কেন-জানি টের পাচ্ছিল, ঠিক এইভাবে, এই কথাগুলো সে লিখতে চাইছে না। এ তার স্টাইলই নয়। কথাগুলো কেমন-যেন অদৃষ্টহীন গল্পের মতো। মসৃণ আর পেলব।

এরকম লিখতে-না-পারার মুহূর্তে ভীষণ ইরিট্যান্ট লাগে কমলের। বিশেষত তখন আরো, যখন সে লিখতে পারছে না, এই বোধ পিক্ত থেকে উঠে বুকের মধ্যভাগে। ... নিয়ন-প্লাবিত টেবিল, টেবিলে ছড়ানো সংগ্রামী হাতিয়ার, কলম ও শূন্য ফরাশ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কমল। বিছানার ওপর রানীর সযত্ন-রক্ষিত দুধে-আলতা অক্টোপাসের পারস্পরিক জড়ানো ডালপালা। একটা উদ্ভট চেতনা তার অসংযত মানসিক স্টেটকে পরাভূত করে ক্ষণিকের জন্যে হলেও স্বপ্নে দেখা মিথুন-লগ্ন নরনারীর বিমূঢ় শরীর বিভঙ্গের দিকে ছুঁড়ে দিল তাকে। সে দেখতে পেল রানী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।— রানী! সে ছুটে গেল। ছুটছে। কমল ছুটে যাচ্ছে, অই। ... তারপর অন্ধকারে, তীব্র অন্ধকারে, নিজের মুখ আড়াল করে, স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে, সে, আরও ক্ষণিকতর স্বপ্নের মধ্যে। ...

নারী কী, আমি জানি না।

কমল এই মুহূর্তে যে লিখতে পারছে না, কমল বুঝল, শুধু একটি অপঠিত নারীর ঈপ্সিত অলঙ্কার ও তার নিরবচ্ছিন্ন অন্বেষা কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে, নিষ্ফল শূন্যবিহার-সম, তাকে ক্রমশ ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে শায়িত, দীর্ঘ বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে এক নারীর দিকে।

কমল যে লিখতে পারছে না, কমল বুঝল, এ তার অভিজ্ঞতার হাহাকার। নারী বিষয়ে কোনো প্রিফিগারই তৈরি হয়নি তার মনের স্লেটে। স্রষ্টা তার চূড়ান্ত মুহূর্তে একটি কেন্দ্রভূম খোঁজে, যাকে ঘিরে সৃষ্টির সুসমৃদ্ধ বেকনোফায়ার। এই মুহূর্তে আমার ধারেকাছে কেউ নেই, যে আমার সহায়। কে এই শায়িত রমণী? কী তার পরিচয়? যে নারী আমার অন্বিষ্ঠ, যে আমার সোনার পাথরবাটি, সেই কি এ? সব ঝুট হ্যায়।

কমল যে লিখতে পারছে না, কমল বুঝল, এ তার যৌন অতৃপ্তির প্রতিদান। এক নিরন্তর পাপ ও তার জিন তাকে অতৃপ্ত রেখেছে। ঐ জিনই তাকে লিখতে দিচ্ছে না। সে লিখতে তখুনি পারবে যখন এই শায়িত ধূসরিত বহুধর্ষিত নারীকে সে সমগ্রভাবে পাবে। লাভ করবে। অথচ, আঃ! এই নারী আমার সমস্ত অভিজ্ঞতার বাইরে। শুধুমাত্র অভিজ্ঞান দিয়ে নারীকে গর্ভবতী করা সহজ কিংবা সমাজস্বীকৃত উপন্যাস। অথচ যে-সৃষ্টি সে দিতে চাইছে, যে নির্মাণ, তাতে স্রষ্টাকে সর্বাগ্রে হতে হয় হার্ম্যাফ্রডাইট, পক্ষান্তরে উভলিঙ্গ। আমি নিজেকে নিজের প্রেক্ষিতে এবং তোমাকে তোমার অধিধ্যানে সুসম্পূর্ণ জেনে নিতে চাই রানী। তুমিই কি সেই, যা আমার অন্তরাত্মার বহির্বাস?

ভাবলে আশ্চর্য, এই নারী আমার নর্মসহচরী। এর সঙ্গে আমার প্রতিমুহূর্তের শ্বাস-প্রশ্বাস। এ কি নিছক এই আমি-র একজন? রানী, তুমি কী-ই বলো তো? আমার শরীর-জীবনের প্রথমজন? আমার যৌনাঙ্গের সহচরী? তুমি কী? নিছক মন! তাও কি সম্ভব? তুমি যদি আমার মন হতে আমার অতৃপ্তি তো তুমিই সর্বাগ্রে বুঝতে। আমার জিন বুঝতে। জিনের স্বার্থ। খিদে। তাহলে, তুমি কী?

রানী,— কমল যেটা বুঝেছে,— গোটা-একটা নাস্তিক আর স্বাধীনচেতা মন নিয়ে, সমস্ত ব্যাপারে জৈব ও যৌবের দৃষ্টিপাত-সহ, মেজাজ ও চাপল্যের যুগপৎ মিশ্রণ, সুতীক্ষ্ণ মতিপ্রকর্ষ ও চরম স্নায়বিকতার বেমিশাল জোড় আর নির্মম অনুশাসনপ্রিয় অথচ চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারী তেওর নিয়ে— সুস্বাস্থ্য ছাব্বিশ। এর বাইরে রানীর পরিচয় নেই, কমল জানে। তবু সে, জেগে থাকার ফি অনু-মুহূর্তে রানীর মধ্যে এক অন্য-নারীকে খোঁজে। যে-নারীর দিকে তামাম পুরুষশিল্পীর অনিবার ধাবন, এবং সেই অন্বিষ্ঠ নারীকে তারা পায় না বলে, তারা শিল্পী। পৃথিবীতে এমন কোনো পুরুষ লেখক কবি ঋষি চিত্রকর রাষ্ট্রপতি জেনারেল অথবা রাগী কিংবা বাগী নেই যে নারীর কাছ থেকে অভিযাচিত যৌনতার অতৃপ্তি ও বৈরক্ত্য নিয়ে গড়ে ওঠেনি। পুরুষ হেডও-আমার টেলও-আমার প্রথায় বিশ্বাসী। এতে অতীব উদার কিংবা বিবাগী, অথবা ঘোর নারীমুখী পুরুষেরও কিছু করবার নেই। সেখানে পুরুষের ব্রেন বলে কিছু নেই। তার জিনই মুখ্য। এই জিন তাকে হাসায়, কাঁদায়, রাগায়, সক্রিয় করে, ড্রাইভ করে, স্টিয়ার করে। এই জিনই তাকে ছুঁড়ে দ্যায়, এমনকী, অযাচিত নারীর দিকে। পুরুষ সেখানে বড় অসহায়। দুর্বল। পরনির্ভর। জিন-সঞ্চালিত। নিকৃষ্ট পাপেট-বিশেষ।

আবার, রানী নিছক রেশনে-পাওয়া নারীর প্রতিভূ নয়। কেননা, এহেন নারী শাস্ত্রে নেই। ইতিহাসে নেই। সমাজে নেই। এই রানী কমলের একান্ত কপোলকল্পনা। বানানো। সিউডো। রানী নারী-সোসাইটির যাদু। পুরুষের সর্বকালিক আকাঙ্ক্ষিত শরীরী-প্রতিমা। এই রানী উপহার দিতে চাইছে পুরুষের নারীচেতনা ও তার চারপাশ বিষয়ে নতুন অভিধা। শিক্ষা ও সংস্কার, ব্রেন ও তার ব্যবহার নারীকে দাম্পত্য, পরিবার, পুরুষ-সহচর বা প্রোক্রিয়েশানের খেলায় মজিয়ে না-রেখে গোটা পুরুষ-সৃষ্ট সিস্টেমকেই যে খেলো প্রতিপন্ন করে আঁৎকে দিতে পারে, সেটা, কমল, রানীকে না দেখলে সঠিক কল্পনাও করতে পারত না। অথচ এই রানী বড়ই নিস্পৃহ। মহাশূন্য থেকে সবুজ গোলাপ তুলে আনায় কোনই আগ্রহ নেই তার।

রানী শুধু পুরুষে অভ্যস্ত, আর পুরুষচেতনায়। যা-কিছু এতদিনে খারাপ লাগতে লেগেছে কমলের, তার মধ্যে, রানীর এই পুরুষপনা। বাহ্যত রানী ঠেট হাই সোসাইটিতে বাড় পেয়েও ইদানিং সর্বাংশে মধ্যবিত্ত, সুতরাং পুরুষ-টাইপ। এ আর কমলের ভাল্লাগে না। আবার, এর জন্যে যে ঝগড়া কিংবা চ্যাঁচামেচি, তাও নয়। কেননা, এই কমলই রানী লুঙ্গি পরুক এই-গল্পে আগ্রহী ছিল, একদা। ইদানিং রানীর পমেটমে গা নেই, চুল বেড়ে যাচ্ছে খামোখা, আর রুক্ষ, শাড়িতে রিফু সহ চোখের কানাচে কালি। এবং, এই যদি চলে, চলতে

থাকে, একদিন তার আধোয়া প্যান্টির খাঁজে মলের গুঁড়িও খুঁজে পাবে, কমল, এবং সে তার জন্য অপ্রস্তুত নয়।

সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা, রানী দিনে-দিনে কেমন ভোঁতা আর ভোঁদি হয়ে পড়ছে না কি? লক্ষ্যণীয় যে, পুরুষের মতো হঠাৎ-বেহঠাৎ জোর শব্দে হেসে বা রেগে ওঠার ব্যাপারে অতীব সহজ আর প্রাকৃত হয়ে পড়ছে রানী। কিংবা, পুরুষলি।, সে অকাতর বাঁকা করে দিতে চায়। তারবাদে, দুমদাম কথা বন্ধ, নিমগ্নতায় গমন। এসব বিস্ময়কর তো বটেই, এতদভিন্ন রিরংসাকালে আছোলা এক-একটি আস্ত আলপিন ওরফে কড়কানো ভর্ৎসনই তুলে তুলে মারে সে, কমলকে। এবং, তা এনডিয়রমেন্ট মাত্র নয়, বরং উপক্রোশ। এতে কমলের কিছু না, কিন্তু রানীর ভোঁতা আর ভোঁদি হয়ে পড়ার এভিডেন্স-স্বরূপ, অনেকখানি।

আর কমল! সেও কি ভোঁতা হয়ে পড়ছে না? হয়ে উঠছে, রানীর রাগালো-মতে, এক বাচাল সংস্কৃতির প্রতিভূ। যা কমল কোনকালেই ছিল না। নিজের শব্দের ভাঁড়ার নিজের কাছে অকুলান ঠেকেনি তার, কোনদিনও। তাছাড়া কমা, হাইফেন, ফুলস্টপ— এরাও যে ভাষা, অন্তত এদের বেজা-ইস্তেমাল সে কখনও চায়নি। অথচ খোদ কমলই সেরকম-ভাবে কথা বলতে লেগেছে, চিন্তা করতে লেগেছে, যেভাবে নারী পারঙ্গম। আর উলটো-ফুটে, রানী ক্রমশ হয়ে উঠছে আকণ্ঠ পুরুষ। কমল নিজেকে যথেষ্ট রতিপ্রিয় ও দেহসর্বস্ব বলে জানত। এ কি রানীর সাহচর্য, যদি সে নিজেকে পশু বা ঈশ্বরের সগোত্র ঠাহর করে? বাথটাবের আবিল জলে নাকের ফুঁটোটুকু-স্রেফ ভাসিয়ে রেখে খালিপিলি ডুবে থাকা,— এ তার সাম্প্রতিক অভিলাষ।

তারবাদে আছে চেঁচিয়ে ওঠা। ছোটলোকের মাফিক হঠাৎ-হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে কমল, ক্ষণে ক্ষণে। তখন কী বলছে, কাকে বলছে, খেয়াল কিছুই নেই। পরে রানীর মুখের দিকে তাকাতে ভয়। বা, ব্রীড়া। মাছের কাঁটা মাড়ি থেকে বের করার সময় যেমন, যেন আনমনে, চোখে চোখ পড়লে, রানী সচেত হচ্ছে তার-আগেই কমল সরিয়ে নেয় চোখ। অবশ্য, চোখে চোখ পড়েনি, গুনেগেঁথে তা-ও কিছু কম দিন নয়। ইদানিং রেওয়াজটা দাঁড়িয়েছে এমন, দু'জনে কথা বলে তখন চোখের সামনে চোখ থাকে না। হয়তো স্বাভাবিকই, এই না-থাকাটা। কথা বলতে হয়, বলে। কিন্তু পারে না বলতে, পুরুষ অভ্যস্ত যাহায়। পরিবর্তে সে কেমন নারীসুলভ রিনরিনে, কাতর ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে উঠছে যেন :

রানী, তুমি আমাকে মাদারলি আদর করো। এই আমি চোখ বুজলুম।

কিংবা, রানী, তুমি পুরুষের মতো ভালোবাসায় গরজি। আমি দেখেছি তুমি ভাবতে পারো, ক্বচিৎ আমার চেয়েও দ্রুত এবং সহজিয়া। তোমার গায়ে তুমুল জোর। তুমি আমায় সঙ্গম করো। তুমি ঠিক পুরুষের নারীপ্রিয়তার ঢঙে, ট্রেচেরাসলি, পুরুষপ্রিয়। তুমি আমায় সঙ্গম করো। আঃ, তুমি আমায় সঙ্গম করো। আঃ, তুমি আমায় সঙ্গম করো। আঃ ...

রানীর মনের মতো প্রস। তুলে জড়ানোর চেষ্টা রানীকে। তামাম ছোটখাটো ম্যাটারে পরামর্শ চায় কমল। যদিও এই নাটুকে বা বানানো ব্যাপারটায় হিপোক্রেসির গমক পায় সে, খোদ। বিশেষত তার পরাদর্শি ভাবনা এতে গোঁত্তা পায়। কেননা, তাদের দাম্পত্যের প্রাথমিক ইজারা ছিল— কেউ কারুকে কিছু গোপন করবে না, ট্রান্সপারেন্ট হবে পরস্পর। কিন্তু নারী এমনই প্রাণী, বিশেষত প্রেমিকা বা স্ত্রী, যার সঙ্গে সমগ্রভাবে স্বচ্ছ বা ট্রান্সপারেন্ট হবার ভ্রূণমাত্র খেয়ালও আত্মঘাতের শব্দফের। এই সাত বছরের দাম্পত্যে কমল তা হাড়ে-হাড়ে বুঝেছে। লেখালেখিতে শুধু নয়, পুরুষকে তার নিজস্ব জীবনেও কৃত্রিম নাটক আর বানানো ক্রাইসিস রচনা করতে হয়। এ হলো 'সুখী গৃহকোণ' রক্ষা করার বেসিক কূটকৌশল,— নিজেরই প্রাণপ্রিয়ার সঙ্গে মাঝেমধ্যে খানিক দূরতা বা ঘুরপথ, পক্ষান্তরে অস্বচ্ছতা রক্ষা করা, এটা।

এবং, এই মুশকিল কারকিত রপ্ত করতে গিয়ে কমল দেখল— মিথ্যে না, সত্যিই আবার ফের-করে সমস্ত কেমন ভালো লাগতে লেগেছে রানীর। পুনরপি সিগারেটে শরণ, বুশশার্টের মাপ দিয়ে এসেছে দর্জিতে। রানী ভরপুর গোঁফ চাইছে। আর হালকা দাড়ি। রানী, তুমি একদিন নিজের ডায়েরিতে লিখেছিলে, ভাষার

আদি শব্দ ‘পুরুষ’। সেটা কেন, আজ তোমাকে দেখে ঠাহর পাই। তুমি ফাঁস করে দিতে চাও পিতৃতান্ত্রিকতার ভয়াবহ ষড়যন্ত্র। যেহেতু, আদিতে প্রাণ ছিল না এবং তা প্রথম আখতিয়ার করে তোমার ভ্রূণে। বলো, ঠিক বলিনি? এ্যাই! কথা বলছো না যে?

এভাবে বলে-টলে রানীর ইগোকেই আশকারা দিয়ে ফেলেছে, সেটা কমল স্বয়ং বোঝে। নিজের এই অসহায় বৈচিক্ত্য দেখে সে হয়রান। তার নিজের মধ্যে ভীষণ নারীপনা গিজিয়ে উঠছে। হুটহাট উচ্ছ্বসিত হয়ে নিজেকে বকবক করে উঠতে শোনে, আর খোদই লজ্জায় কাঁটা। ভাবে, এই কি আমি? মনেপ্রাণে নিজেকে বুঝ দিতে চায় যে, সব আগের মতোই আছে, মিছিমিছি এই ভয়ের সাফোকেশান।

উলটো-পোলে, রানী সেই আগের মতোই। ফের নেই কোনো। কমলকে উচ্ছাসিত হতে দ্যাখে, আর সাপের শীতল চাউনি সমেত ধোঁয়াহীন সিগারেট-মুখে নিস্পন্দ জরিপ। রানীর নীরব, কঠোর, শীতল তুষ্ণীভাব বারদিগর ত্রাস ধরিয়ে দেয় কমলের বুকে। তুমি কি ফলো করে যাচ্ছে, যে, কখন কিভাবে আমি মুচকে পড়ি, ব্যাস, আস্তিন উঁচিয়ে ধরবে তুমি! ওফ।

কমলের বাড়িতে বসাক বিল্লু নুনা ভচি মদনার ঠেক। এ-ভিন্ন বাবর আসে। রানীকে দেখেছে, সবার, বিশেষত বাবরের সঙ্গে, কী অবলীলায়, সশব্দ প্রমুদিত। কমল হয়ত টেবিলে একমনে লিখছে কিছু, কিংবা লেখার চেষ্টায়, ওরা হাত ধরে চলে গেল ছাদ-লাগোয়া বীরান টেরাসে। কচি কুকুরের ক্ষুদে ক্ষুদে পায়া লাগানো বেত্রাসনে বসে খোসা-ভাঙা বাদাম আর সতেজ গল্প, অনিবার হাসি। তখন রানীকে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকেই ভারমুখ লাগে না। ওর কি এক-পুরুষে বিবমিষা জাগছে? পলিগামির ঈহা? ও-হো! কমল হয়ত মিছিমিছি জল খাওয়ার ছলছুতো বা পেচ্ছাপের বাহানায় হঠাৎ-উঠে বাথরুমে গেছে, ঝলক মাত্রে চোখে পড়ল বাবর হয়ত সিগারেট ধরাচ্ছে, আর আনত মাথায় রানী— বুক বেশরম, অধরে ধূর্ত ছুরি, কনকনে কানখি পরপুরুষের উদ্দেশে। আশ্চর্যত, রানী তখন বেশুমার নারী, সে যথাযোগ্য লাজুক, লজ্জাশীলাও যোগ্য-হারে। কমলের দিকে চেয়ে না-দেখতে-পাওয়ার শ্রেষ্ঠ ভান করে অকারণ একটা ক্যালেনডুলাই হয়তো টুনিয়ে ফেলল কুট করে। হায়, রানীর ঝলক-একের অশ্ময়তাও কমলকে বেহদ হতোদ্যম করে। সে বারদিগর ফিরে এসে খাতাপুস্তকের ডাঁইয়ে আছড়ে ফেলে নিজেকে।

কিন্তু কাঁহাতক? কমল ক্যালকুলেট করে দেখেছে, অফিসে বড়জোর দশ ঘণ্টা কাটানো সহজ, লিখে-টিখে চারঘণ্টা, ঘুমিয়ে সাত, নাইতে খেতে পায়খানা বাবদ আরও দেড়, — এর বাদেও আরও দেড় থেকে যাচ্ছে তার হেপাজতে। দে-এ-ড় ঘণ্টা! এই আনচাহা দেড়টি ঘণ্টা তাকে কাকতাড়ুয়ার মতো এই বেজার মাগীটিকে দরশন-মাত্র করে কাটাতে হয়।

ও দিনে-দিনে খিটখিটেও হয়ে উঠছে ঢের। না, ন্যাগিং ঠিক না। আসলে নিজেকে কেমন গুটিয়ে নিচ্ছে, অন্তত কমলের নাগাল থেকে, এবং দ্রুত। নিজেকেই শুধু কেন-বা, নিজের দেহটাকেও। মিতভাষিণী রানী, হয়ে উঠছে দুর্ভাষ। স্বল্প শব্দে আঘাত হানার টেকনিক কেউ শিখে যাক ভারতীয় মডার্ন গিন্নির হেপাজতে। এতই টেটন এ-ব্যাপারে, যেন, আঘাত হেনেই সুখ। উপরন্তু, ইদানিং যেটা হচ্ছে, কমল ফলো করছে, তাকে চোট দেবার জন্যেই হরদম মুখিয়ে রানী। চোট দিতে পারগত হলে তবেই তার ভালোবাসার ডিমে তা। প্রাণী-মাত্রেরই তীব্র বেধনযোগ্য একটি করে হুল। দোবরা-মুখে ঐ যে নাগাড়-মার্চে লিপ্ত পিপীলিকার সারি, কী তার লক্ষ্য দেবা ন জানন্তি, কোথায় — এমনকী, তাহারও। এবং, কমল তার হাঁটুমাত্র সমান বুকসেলফের ছোট্ট দায়রায় গোনাগুনতি আঠাশখানা বইয়ের মাঝে এখনো-অবান্তর-হয়ে-পড়েনি গল্পগুচ্ছের একটি ধুলোমলিন খণ্ডে ঈষৎ পড়েছিল— বৃশ্চিকের মুখে নয়, হুল থাকে তাহার পিছে। তো, কমলের বল্টু কষতে বা তাহাকে টাইট দিতে, রানীর সেই পাছদুয়ারি হুলাক্রমণ। অর্থাৎ, বিছানা।

রানী তার ডিভান আলাদা করে নিতে চায় সেই আড়াই-তিন বছর আগেই। আলাদা বালিশ। আলাদা বেডকভার। আলাদা সাঁজাল। সে হয়নি স্রেফ কমলের জেদে। তাইতেও কি। এখন এই একটি-ভিন্ন-নেই বিছানায় উঠতে গেলেও, বিশদ অপদস্ত। রানী এ প্রেক্ষিতে বেজায় নির্মম। তোল্লাই খেয়েও খেলায় নামে না।

তারবাদে, ভয়ানক বেধনাস্ত্র। কমল ফের এও বোঝে, এই বেধন বা অপমান থেকে নিস্তার পাওয়ার মোটা গোছের টোটকা হলো রাতারাতি হিপোক্রেট হয়ে ওঠা। মানে, নিজের পরাদর্শি ফিলজফির একদম বিপরীত প্রান্ত থেকে রানীর কাছে নিজেকে আছড়ে স্বীয় অস্তিত্বকে বিলকুল অস্বচ্ছ, ধোঁয়াটে আর পরপুরুষের মাফিক গোটাগুটি ভোগ্য করে তোলা। ওফ।

রানীর তরফ থেকে মোটা হরফের আরেক বেউচক্কা প্রবলেম হলো, কমল ওকে নিয়ে কী ভাবছে, রানী বোঝে না। কমল কি শুধু শরীরে আগ্রহী? রিসিপ্রকেশনে? উহুঁ। কমল যেটুকু বুঝেছে, নারী শরীর ‘দ্যায়’ পুরুষের কদর পেতে আর পুরুষ দ্যায় নারীর গতর ‘পেতে’। এই জুমলা ক’বছর আগে সে অন্যভাবেও ভেবেছিল, যে, নারী শরীর ‘দ্যায়’ পুরুষের ভালোবাসা পেতে আর পুরুষ ভালোবাসে নারীর দেহ ‘পেতে’। — এই উভয়বিধ গল্পেই এখন বৃহৎ ফ্যালাসি। বস্তুত, কমলের মনে হয়, কোন পুরুষই, সে যদি প্রকৃত পুরুষ হয় বা নিজের ‘পুরুষ’কে খুঁজে পেতে চায়, এই শরীর ও শারীরবৃত্ত থেকে তার মুক্তি নেই। অথচ, পুরুষ আবদ্ধ হতে গরস্বীকার। তার স্বভাবই এই, ছড়িয়ে যাওয়া, ছাড়িয়ে যাওয়া। ভয়ংকর অন্ধকার খাদের মুখে উঁকি মেরে দেখা— কী আছে এরপর। এটা পুরুষের স্বভাবই বা কেন, বলা যায়, পুরুষের নিয়তি বা জিনই এরূপ করতে বাধ্য করেছে তাকে।

বুদ্ধু খুড়ো পাশেরবাড়ির ছাদে উঠে
রোজ ফুঁকো মারত ভেন্টিলেটার দিয়ে। একদিন

কমল ঠিক করে রেখেছিল খুনটা আসবে এক্কেবারে শেষে, দুমসে। মূল আখ্যানের সহিত তার যোগও বিশেষ নেই। কেননা এ গল্প প্রেমের। প্রেম ও যৌনতার। শরীর ও ঘিলুর। আর, প্রেম প্রণয় শরীর যৌন ভক্তি এসব এলে, পাঠক ঠিক অনুমান করছেন, আর-অন্তত একটি যোগাড় লাগে। অর্থাৎ চরিত্র। এবং তারে বেশ তাগড়াই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা লাস্ট-সীনটা পুরো তার ওপর বেস ক'রে। সুতরাং তাহারও যথাদৃশ্যে অবতীর্ণ হওয়ার মনসুবা।

কমলের ছয় ইয়ারের মধ্যে, অ্যালফাবেট মানলে, আমার নামটাই পয়লা।

কমল বলল, 'বাবর, সবদিক ঘেঁটে দেখলুম, তুইই ফিট। রানী তোকে লাইক করে। তুই রানীকে। পারলে তুই আরও মেশ। মিশে মিশে যা। কিভাবে মিশছিস সেটা ফলো করব আমি। ফলো করে-করে লিখব। ধর, তুই একদিন ওর হাত ধরলি, হাউ ডেয়ার ইউ বলে হয়ত হাতটা ছাড়িয়েই নিল রানী— সেইটে কপি করব। পারলে বরং কাঁখতলিটা ধরিস। হেবি উখো মারা, গ্রাইন্ডেড। দেখিস।'

'শাহলা, অ্যাড়া, হারামির বাচ্ছা ...'

'আহা, অত ভড়কালে চলে? ভড়কাচ্ছিস কেন। চুপ বোস। এটা তো গল্প। ওরিজিন্যালি তুই কি আর চুমু খাবি! তোর রেস্ত আমার জানা। শালা হিপোক্রেট! দোগলার ব্যাটা চোগলা! ফুলস্পিডে হাগা পাচ্ছে তবু মুখে জ্যান্ত হাসি। এসব তোদের আসে। তোরা পারিস। কিন্তু আমি হচ্ছি টাস্ক মাস্টার। তোকে দিয়ে সব প্লে করিয়ে নেব। বিল্লুর মার বুকে উল্কি, গোদনায় ভরা দুদু। তোকে দেখাইনি? সব শিখিয়ে দেব। হোমটাস্কটা মন দিয়ে করে যাস শুধু। কাল তো শনিবার। তোর কী প্রোগ্রাম?'

আমি লোকটা দেখতে, যেটুকু জানি, কাগাবগা টাইপ। কোনো মানে হয় না। বলব কী, বাঁ থেকে ওম পুরী, ডাহিন থেকে অমরীশ। গায়ের রঙটা ভাজা রসুনের মতো। ক্ষরা করে ভাজা। বা, তার-চে এক পোচ ফর্সা বড়জোর। ববলিন-ওঠা সোয়েটারের মতো চামড়া। টেকো নই। পলিত কেশ দু-চারটে। খুদে খুদে কাঁচা চুল, ঈষৎ গোড়ানো। গোল মাথা। দেড়েল নই। তবে, কচি শজারুর লেজের সদৃশ গুম্ফ। ওইটে আমার মাদুলি। আমার, আর আমার থোবড়ার।

আমাকে মূলত দেখতে কেমন তাইলে বলি। চোখের ছই ঘেঁষে অলক্তরাগ। চামড়া ফুঁড়ে লাল শেকড়গাছি। এমন যে, চট-সে বোঝা মুশকিল এ হিঙ্গুল রক্তের, নাকি মারকিউওক্রোমের। উত্তেজনায় ঠোঁট কাঁপে, তথা চোয়াল। তখন ফের লালের ঐ বিদ্যুল্লতা। রানীকে দেখতুম আমার অধরের দিকে চেয়ে। হাঁ, চেয়ে।

বাস্তবিকই, ঠোঁট আমাকে আলাদা খাতির দিয়েছিল। ঠোঁটের পুরোটা নয়, শুধু ঐ অধর। অনেকটা মনোজকুমার টাইপ। প্রবল পুরুষ্ট। সৃক্কণে পুনরায় লোহিত চিনিকণা। ক্রিমসন। চেয়ে থাকত রানী। হাঁ, চেয়ে।

শনি-শনিবার আমি কমলের বাড়ি। শনিবারের বিকেলটা, এসপেশ্যালি। যেহেতু অল্প গড়ালেই পুরো একটা প্রডিগাল ইভিনিং, প্রফ্লিগ্যাসির হুড়দুমবাজি।

'আরে, খবরগির যে!'

ডোরাকাটা পর্দা সরিয়ে গুলতি-প্রতিম চোখে রানী। হাসতে চাইল। ঠোঁট বেঁকে গেল শুধু। আলপাকা কাপড়ের ভয়ানক কুঁচি আর চিরাচরিত ঘের নিয়ে গোড়ালি-অব্দি লুটিয়ে পড়া তার সেই পেটেন্ট

গৃহপোশাক। ম্লান ও স্লথ হাতে দরজা ছেড়ে দিল। দুপুরের রোদ পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল বোধহয়। চোখদুটি ঈষৎ ফোলা।

ঘরে ঢুকে বলি, 'আচ্ছা, একটা হাসি তুমি হাসতে। প্রায়ই দেখতুম। ঠোঁট বাঁকতে না দিয়ে, স্রেফ চোখ দুটো নাচিয়ে। সেটা আছে?'

'খুঁজতে হবে।' খানিক লঘু আর অলস হেঁটে রানী সোফায় গিয়ে বসল। 'আজকাল মাথার ঠিক থাকে না, জানো, কোথায় কোনটা রেখে কোথায় খুঁজি! এই যে তুমি এসেছো, কোথায় বসতে দেই বলো-তো!'

'কেন, তোমার চৈত্ররথে!'

'আইডিয়া!' রানী উঠে দাঁড়াল, 'ঘরের রোদ্দুর এখুনি স্লিক করে যাবে, ইস, তুমি এই ঠান্ডায় সোয়েটার গায়ে দিয়ে বেরোওনি। দাঁড়াও একটা চাদর বের করে দিই তোমাকে।'

তক্তোপোশে লোটানো বালিশের তলা থেকে একটা গরম চাদর বের করে এগিয়ে দিল রানী— 'শীতটা যাই-যাই করেও আর যেতে চাইছে না, আজ আবার মেঘলা মতন, বাতাসে কত পোকামাকড় দেখেছো! কী নিয়ে আছি আমরা! টিভি, তুতুলের হোমওয়ার্ক আর ফলিডল ফিনাইল।'

'কমলও এমনি-কিছু বলছিল',— পায়ে পায়ে ছাদে বেরিয়ে আসি। রানীর মুখের দিকে তাকাই: 'তোমরা নাকি বড় কষ্টে আছো। আচ্ছা, এই ফুলগুলো কি শুকিয়ে যাচ্ছে নাকি তুমিই আর ভালোবাসো না আগের মতো?'

রানী পাখির ডানার মতো ভুরু বেঁকিয়ে একপিস চাইল আমার মুখের দিকে। আমি মৃদুমন্দ। রানী বলল, 'শুকিয়ে যাচ্ছে বলছো কেন? এই দ্যাখো তাজা দোল।।'

টেরেসে গেলাপ বিছিয়ে এই আমাদের প্রথম বৈঠক। চান্দ্বারে ফুলের পিঠে ফুলের ঠেলাঠেলি। ঠিক রবীন্দ্রনাথ যেভাবে দেখেছিলেন। জম্পেশ খোশবাই। আমার আরও ভালো লাগে খুব লগ্ন হয়ে বসা যুবতী পরদার। তার রাং ও নিতম্বের বর্দ্ধিত বিভঙ্গ। তার টার্জিড গাত্রত্বক ও মর্মরের শিশুদেবতার মতো অবিরল ও নমিত দৃষ্টিধারা।

সত্যিই তাজা, এবং লোভনীয়। আমার বউয়ের-গুলো এতখানি দ্রঢ়িষ্ঠ যে কবে হবে! আমি ওই পরকীয় দোলঙ্গের দিকে চেয়ে, ধরা দেব না, এমত কায়দায় বলি, 'কতদিন জল দাওনি তুমি! তবু কেমন উন্মুখ দ্যাখো! আচ্ছা, জল না পেয়েও, একা একা, শুধু আলো আর বাতাস নিয়ে একটা দোলন কি কাঁঠালচাঁপা বেঁচে থাকতে পারে?'

'তুমি কি কবি?'

'কেন?'

'না। কেমন করে কথা বলছো ঠিক কবিতার মতো।'

'কবিতা কি অপছন্দ তোমার?'

'জীবনে কবিতা কম থাকলেই ভালো। ঐ আর্মানিয়া ঘাট থেকে হাওড়া স্টেশন যেটুকু। নইলে জেটির মজা হাপিস। তুমি কেমন ঘুরিয়ে কথা পাড়ো ভালো লাগে না আমার। অন্য কিছু বলো। অন্য ভাবে।'

'আচ্ছা এবার স্ট্রেট-কাট বলছি।' সৌখিন জিনিস ছোঁবার মতো করে আলতো হাতে রানীকে ছুঁয়ে বললুম, 'তুমি ফের একটা বিয়ে করো। কমলকে। এবার লগনসা চতুরাক্ষ গাছকৌটো ধৃতিহোম ধুলো-পা এসব থাকবে। আমরা হৈহৈ করে খেতে আসব। শয্যাতুলুনি হবে। রিসর্টে তিনদিন চাররাত। মুফতে নৌকোবিহার। করো। করেই ফ্যালো।'

'নাঃ, তোমার মাথাটাও দেখছি গ্যাছে।'— হাতটা আলগোছে খসিয়ে নিল রানী : 'তুমি না পাড়ার এক্স-মাস্তান! ডাম্বল ভাঁজতে! বেশ কিছু কাঁচা দাঁত তোমার মর্টার। আর এ তুমি ধান ভানতে এসে কিসের গীত ধরলে! চাঁদসিটা চলছে, নাকি বেচে খেয়েছো?'

হাসতে আমি বাধ্য। হেসেই বলি, 'জানি তুমি স্পুন রেসে ফার্স্ট, ফেন্সিং-এ মেডেল। তোমার অনেক এলেম। কোন ফ্যালাসি নেই তাতে। সামারসল্ট, স্প্রিং, প্ল্যাটফর্ম। কিন্তু কী জানো, ঐ যে বললুম, উলকাঁটা বয়েলআন্ডা ছাড়াও জীবন চলে না। প্লিইজ, কমলকে বাঁচাও। দারুণ ভক্ত তোমার। সদয় হও। মিছিমিছি ঝগড়া তোমাদের। ওকে বিবাগী হতে দিও না। তুমিই সুইম করে ডাঙে তোলো ওকে।'

'উফ, কী শুরু করলে বলো তো! সেই কখন থেকে কমল, কমল আর কমল। তালে শোনো।'— ভুরু দুটো জায়গা ছেড়ে ঈষৎ উঠে গেছিল, আবার নেমে আসে নিজস্ব ফ্রেমে। রানী বলল, 'ওর মেন্টাল ডিরেঞ্জমেন্ট আছে। সেটা জানো?'

'ডিরেঞ্জমেন্ট!' আমি বেশ মজা পাই। চাদরের মধ্যে কনুই গেড়ে, থুতনিতে তালু, সকৌতুকে তাকাই।— 'কীরকম?'

'বউকে ভালোবাসতে পারে না। টাইম নেই। বউ এড়িয়ে গেলে ডোট করতে ভয়। বউয়ের বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে পারে না। নিজেকে কেমন গুটিয়ে রাখে। সংসারের কাজে মতি সাবাড়। বেসন আনতে বললে ছাতু নিয়ে ফেরে। সুইসাইড করতে গেছিল পরশু, জানো! কুকুর-বাঁধা ফিতেটা দিয়ে। ভাগ্যিস, নাকি, তুতুলের মুখটা ভেসে উঠেছিল! তাইতে রিটার্ন এলো। তারপর থেকে তো আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই চোখ নামিয়ে নিচ্ছে। একা-একা বোকার মতো লিখে যায়, শুধু। এসব কী, বলো!'

'এভাবে টেনশন আর পিক্তির ইগনিশন নিয়ে, ঐ তুমি যাকে বলছো বোকার মতো, একা-একা, নীরবে, নিস্তেজ, বিবেকহীন আর রেস্টলেস লিখে যেতে চাইলে, আমি অ্যানাউন্স করে রাখলুম, কমল পাগল একদিন হয়েই যাবে সিওর। হ্যাঁঃ।'

'পাগলই তো।'

'আবার বলছো?'

'কেন, ওইসব সিম্পটম!'

'সে তো আমারও আছে। ...'

'তোমারও! কী আছে?'

'সাইকোসিস।'

'উহুহুহু! কী হরিবল নাম রে বাবা! শুনলেই গা ছমছম করে।' রানী বুক-দুটোকে হাত দিয়ে শালের ওপর থেকে গুণচিহ্নে বাঁধে।

'যৌন-অতৃপ্তিতে ভোগে না?' জবাব আদায় করব বলেই পার্ক করে তাকাই।

ব্রীড়া নয়, তনিক রীঢ়া কিংবা বিস্ময়ও না। যেন এ-প্রশ্ন শুনবে বলে একরকম প্রস্তুতই ছিল।

'তুমি কিসে বুঝলে?' সে ঠোঁট জুড়তে ভুলে যায়, আর বেয়দপ আঁখিঠার।— 'ভোগে। ভালোই ভোগে। হরদম খাইখাই করে। আমি দেই না।'

এবং সে চোখ নামায় আর একটি ঘাসের ডাঁটি তুলে নেয় মুখে।

'এইজন্যেই ওসব করছে।' আমি চাদর তুলে নিই। একটু অশ্লীল-মতন শীত করছে। আর ঘাম। 'খেতে দাও। দেখবে সব ঠিক লাইনে এসে যাবে।'

'ব্যাস! কাঠি মেরে চলে যাচ্ছো?' রানী কোমর সিধিয়ে উঠে দাঁড়ায়, আর চকিতে হাত ধরে আমার, 'প্লিজ, আরেকটু বোসো। ভাল্লাগছে। দ্যাখো কেমন হালকা লাগছে আমাকে!'

উফ। আমি ওর স্পর্শ-শলাকা ঠেকাবার ব্যগ্রতায় হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াই। আগের কথায় ফিরে যেতে চাই। তুলোমেঘের ভাসমান ঢেউয়ের পানে তাকাই। আজ কি ঝড় উঠবে, একটু? মেঘেদের কচি জমঘট দেখে তাই তো মনে হচ্ছে। ফুঁ-বেগে আদরের কমসিন শিরশিরানি খেলছে বাতাসে, বরফের কুঁচির মতো হিলহিলে ঝাপট। তেমনি হঠাৎ বলে উঠি, 'আমার মনে হয় তোমাদের পৃথিবী-দুটো খুব কাছাকাছি আসতে গিয়ে কলাইড করেছে। একে-অপরকে বেগানা লাগছে, তাই বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে। আবার বোঝার জন্য নুইতেও

চাইছো না কেউ। অথচ চাইলেই পারো। কনজুগাল ক্রিকেটে ড্র থাকতে নেই রানী। মজা মাটি। তোমাদের কারো সাডেন ডেথ দরকার। টাইব্রেকার, একটা।'

'হ্যাঁ',— সদ্য জেগে-ওঠা ঘুমের জড়ানো গলায় ফিরে যেতে যেতে পরবর্তী কথাগুলো হঠাৎই বাঁক খেলো রানীর,— 'দ্যাখো, একটা ভেতরের কথা বলি। কাউকে বলিনি। এই প্রথম তোমাকে। কিছুদিন আগে তো ভেবেছিলাম, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে পালাবো। গুরগাঁও। ওখানে বাবার আর আমার নামে জয়েন্টে আড়াই লাখ টাকা আছে। খেপে খেপে তুললে আমার আর তুতুলের, দুটো পেট দিব্বি চলে যাবে। আমি এরম-সেরম মেয়ে নই। সেলফ-অ্যাসারটেড। দারুণ স্বাধীনচেতা। কমল জানে। তবু শুধু-শুধু কষ্ট দেয় নিজেকে। এসব ভেবে।'

রানীর ঠোঁট কিঞ্চিৎ অভিমানী দেখায়, খানিক ফোলা। গলায় ষোলো আনা অস্মিতা। 'ফের', সে বলে, 'পালাবার চিন্তাটা ক্যান্সেল করলাম। এখন ঠিক করেছি, ও যদি পাঁচে নামতে পারে, আমি ছয়ে নেমে যেতে রাজি। কথা দিচ্ছি।'

যাহ ব্বাবা! কোৎ থেকে কোথায়! কোন মুখবন্ধের কী উপসংহার! তবু, আর্জি নেই অর্ডার নেই, গোটা বাতাবরনটাকে কেউ যেন এক মুক্কায় পালটে দিয়েছে। এর পেছনে কারো চক্কর নেই, কুচক্কর নেই— এক মনের রুদ্ধ বাতাসে জোর একটা দমক, এ বাদে। হঠাৎ খুব ভালো লেগে গেল ওকে। অনেকটা এমন যে, ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ক্রিকেট হচ্ছে, মাঠে একযোগে বারো জন বাঙালি,— সেইরকম আর-কি, মনটা খালিপিলি আনন্দে ভরে উঠল।— 'বাঃ, এই তো লক্ষ্মী মেয়ের মতো কথা! মিছিমিছি ভুল বুঝি তোমাকে। যাও, কমলের ড্রয়ার থেকে মেরে এক পিস সিগারেট নিয়ে এসো তো! দু'জন মিলে খাবো।'

'সঙ্গে চা কিংবা কফি?'

আমি না বলি না। পারি না। এবং অকুণ্ঠে সা-আত বছর ধরে একান্ত ননডেসক্রিপ তথা প্ল্যাকাবল এই মেয়েটির জন্যে সঞ্চিত সততা, ভালোমানুষী আর শ্রদ্ধা নিবিড়ভাবে উজাড় করে দিয়ে মাথা নাড়ি।

পরক্ষণে, সচকিত হয়ে চিনতে চেষ্টা করি নিজেকে। আদপেই কি অকুণ্ঠে? সততা, শ্রদ্ধা এ? বিন্দুমাত্র ক্লেদই কি ছিল না তাতে? কেন? সিগারেটের এক পরমাণু-অংশও তাগিদ অনুভব না করা সত্ত্বেও, কেন এই সুতীক্ষ্ণ মাথা নাড়া? রানীর ক্রমশ-জেগে-ওঠা খিল্লি ও লাস্যের কাছে একান্ত পরাস্তই কি হয়ে পড়ছে না মন?

অথচ, নিজের জন্য নয়; এতক্ষণ সমুখে বসে থেকে যারপরনেই নির্মম আর বাতুল মনে হলো যাকে, সেই রানীর জন্য যথাসাধ্য সুস্থতার সুপারিশ জানালুম আমি পীরের মাজারে। মহাকাল চেয়ে দেখল।

রাতশেষে রাসপুটিন জিগোলো, তোমরা আর ক'জনা গো?

সে-রাতে তুমুল ঝড় ওঠে। অজস্র শিলাবৃষ্টি, তারপর।

গোড়ার ঘণ্টায় খেলা ছিল চিকের আড়ালে, দেড়টা নাগাদ এলো ঝেঁপে, আর বোরখা পুরো নুচে। 'দেড়টা' মনে থাকার যথেষ্ট লজিক। কেননা, দু-ঘণ্টা আঠাশ মিনিট পাক্কা একটানা কলম উঁচিয়ে বসে থাকার পর যখন এটা একরকম প্রমাণ হয়ে গেল, যে, নাঃ, এ-রাতে শেষ ক'টা প্যারা লিখতে সে পারবে না কিছুতেই — এমন ব্যর্থ ও পরাজিত মনস্তত্ত্ব নিয়ে রাত দেড়টা নাগাদই কমল টেবিল ছেড়ে উঠে সশরীর বিছানায় এলো। তখন না-থামার জেদ বাইরে, বৃষ্টির। মুক্তকেশী, অবলা কোনো কামিনীই বুঝি স্লুইস খুলে ছেড়ে দিয়েছে চুলের তোড়। অবলা, কেননা এ অঝোর বরিষণের কোনও শব্দ নেই; স্পিডতোলা ট্রেনের নিশুতি শব্দের মতো তাহার নিঃশব্দ ঝরণ। জানালার তিলেক ফাট দিয়ে একটা মিহি চিরুনি-প্রমাণ জলের ঝাপটাও লাগল ওর মুখে।

আজও রানী আলাদা চাদরে, শরীর ঈষৎ ঢেকে, হাড়গোড়-ভাঙা 'দ' হয়ে শুয়ে। পাশে তুতুল, ঘুমিয়ে কাদা। মাঝের প্যাসেজে বাথরুমের এসে-পড়া প্রচ্ছায়ার ফালি জেগে থাকে সারারাত। ভাবলে আশ্চর্য, এই ব্যবস্থা আজ সাত বছর। একই বিছানা, একই তোশক, একই শিথান। শুধু মাঝখানে শীর্ণ আভাতি। নিজেকে ভারি সফোকেটেড লাগে কমলের। হয়ত রানীরও লাগে। বিশেষত যখন নিঝুম রাত, এবং নাকসাটহীন উদানের শব্দ, শুধু।

এহেন গহীন ফ্রাস্ট্রেশনের কোনো কোনো রাতে, প্রায় রাতেই, শতকরা নিরানব্বুই জন বিবাহিত বাঙালি কবির মতো কমলও সেই মেয়েটির স্বপ্ন দ্যাখে— যাকে চিৎ শোয়ালে বুকের বাটি-দুটি প্লেট হয়ে ঝিমিয়ে পড়ে না সহসা, আর, পাঞ্জার আওতায় পোরা খাজুরাহো-বুকের মরিয়া ঝাপট। এটা হলফ করে বলা যাচ্ছে, কেননা কমল জানে, বাঙালি বিবাহিত-যুগলগোষ্ঠির দাম্পত্যের গল্পগুলি মবলগ একই। এমনও আদিম মানুষ আছে, মাঝেমধ্যে কাপড় পরে, এবং চশমা। কিন্তু জামাকাপড়-পরা মানুষ কখনো আদিম হয় না। হিসি ও বীর্য, মূলত দু'প্রক্রিয়ায় ঝাঁকান দিয়ে দেহের বিষজল ঝেড়ে দেয় ঠিকই— এছাড়া স্বেদের কিছু কাতরোক্তি থাকে কারো কারো নসিবে। কিন্তু রাতের বিছানা এখন সেহন বিলাপধর্মী নয়, আগের মতো— কিছু হাত নাড়া, মাথা ঝাঁকা, দোয়াতে সরের কলম ডুবিয়ে সা। হরেক রতি।

ধূসর চাদরে ঢাকা মরা দম্পতির নড়াহীন দেহ, মাঝেমধ্যে তবু কমল নড়ে ওঠে স্পর্শহীন ক্ষুধায়। দাম্পত্য — বাকি কথা লোপাট হয়ে এ কথাটি রয়ে গেল মৃতদের মাঝে।

নাকসাট বাবদ মনে পড়ল, বাতকর্ম। কী যে কখন মনে পড়ে কমলের! তা, সে-ও তো কানে বাজেনি বহুদিনই হলো। কী কুক্ষণে একবার কমল চুপিসাড়ে শুনে ফেলেছিল, বলায়, রানী এক্কেবারে খুন্তি-হাতে মুখিয়ে এসেছিল। 'কক্ষনো না, অমন ধাত আমার নয়ই।' এমনিতে কমল যখন-তখন, রানীর ধাতানি খেয়ে দু-একদিন ক্ষান্ত হয় ঠিকই, কিন্তু ধাতানির রেশ ফুরোতেই ফের যে-কে-সেই। এটা কমলের স্বভাব। কমল স্বীকারও করে সেটা। কিন্তু রানীর কবুলতি নেই, উলটে মারতে আসে। তর্কে কলহই সার। ক্যাট পশ্চরে, যোগাসন-কালে, অথবা ঘুমন্ত শয্যায় খানিক বেশি শ্বাস নিয়েছিল, কিংবা, বের করে ফেলেছিল বলায় যে মারাত্মক অপবাদ দেওয়া হয় না, এ কথা রানী কমলের বেলায় যত সহজেই বুঝুক নিজের ক্ষেত্রে হামেশা হাতা-খুন্তি। এটি তাহার স্বভাব। ঘুমেও নাকি সে নিশ্বাস নেয় রাবীন্দ্রিক রিদমে!

আচ্ছা, রানী কি সত্যি ঘুমিয়ে? কই, নাক তো একবারও ডাকেনি! কেন-যেন মনে হলো কমলের, রানী ঘুমিয়ে নেই। ঘুমোনোর ভান করে দম রুখে শুয়ে আছে মাত্র। বরফনীল পায়ের গোছ অপরিসীম বেরিয়ে।

সেথায় কাপড় নেই। কিংবা, শায়ার ফ্রিল। রানী আজ হঠাৎ কেমন রূপসী হয়ে উঠেছে না? রূপসী, হ্যাঁ— আলো নেভাবার আগে কমল ওর মুখে একটা টলটলে আরক দেখেছে। আবক্ষ ক্রিম, পরিপাটি ম্যানিকিওর। মেঘ-সমাকুল চুল। আর চুলের চিক দিয়ে ঘেরা মুখডিম্বটি একযোগে গোটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বলেই কি, আজ, অমন, সেক্সি দেখাচ্ছে! সেক্সি, আর রম্য? মেঘনীল কালারের তাঁতীয় শাড়ি। কিংবা, একেই কি বলে ঝামররাতের মেঘসজ্জা? তাহলে তো তিমির থাকতে হয় চোখে! রানী কি আজ কাজল পরেছে! কজ্জলিকা?

রম্য! শব্দটায় কেমন ফেঁসে গেল কমলের মগজ। এটা ঠিক, যে, মুখ নয়, মুখেই শুধু নয়,— গাল লাবণি, তার আদ্রতা বা টার্জিডিটি দৃশ্যমান যথার্থই, কিন্তু আত্মার পথভ্রান্তির ভাগী ওটুকুই কেবল নয়। তাহারও অধিক, সেক্সি ও রম্য দেখাচ্ছে শরীরটা, দেহটা, এরকমই বরং মাথায় এলো। তাঁতের শাড়িটা আজ কিঞ্চিৎ ফাঁপিয়ে পরেছে বলেই কি? তায়, আড়কোলের ঢেউ বড় জ্যান্ত। এবং তাতেও, কিঞ্চিতাধিক যৌব ও ভরন্ত লাগছে বুক-দুটো। ছোট্ট সেফটিপিনে আঁটা নীলচে আঁচলখানি খসে গিয়ে ঐ তার গভীর-চেরা ক্লিভেজের মারকাটারি চিড়ফাঁট,— কমলের লোভ হচ্ছে না? অল্পক্ষণের জন্যেও লোভ হচ্ছে না কমলের? ... ওহ, কাম অন! তা-বলে ষাঁড় তো আর নয় যে ঘসঘস করে কিছু বিচুলিই খেয়ে নেবে! প্রেম শব্দটাকে কমলের আনখা আর অর্থহীন মনে হলেও, অন্তত মেয়েদের সঙ্গে শরীরী-শরোকার ব্যাপারে,— এক্ষেত্রে শরীরই নিছক নয়, অন্য কোথাও, হয়ত মগজে, হয়তো হৃদয় ফুঁড়ে গজিয়ে উঠছে একটা বেলাগাম ভুড়ভুড়ি— হ্যাঁ, কামনাই যাহার সমার্থশব্দ, ঠিক তাই,— এবং, ইতিহাস যার উৎস। একমাত্র মানুষেরই ইতিহাস-চেতনা আছে, ষাঁড়ের নয়। কমল বোঝে। এবং, এই মুহূর্তে কমলের চেতনা বা মগজের বার্তা যা,— এই বহু-ব্যবহৃত বহুবীর্যিত নারী সে-ইন্ধনের যোগান হরগিজ নয়;— যে হতে পারে, এখন এই মুহূর্তে, তাকেই সে, কমল, স্বপ্নে পেতে আগ্রহী। স্বপ্নে, এবং বাস্তবে। অন্তত, এ নয়।

কমল নীরবে পিঠ ফিরে শুলো, তুতুলকে জড়িয়ে।

নাঃ, ঘুম আসছে না। উপন্যাসের শেষ ক'টা অনুচ্ছেদ ... ওহ, কী লিখবে এরপর ভেবে পাচ্ছে না। চোখ বুজে সে ভাবার চেষ্টায় আপ্রাণ। এমন বহুরাত গেছে, স্বপ্ন দেখে উঠে স্বপ্নে-পাওয়া একটি শব্দই হয়তো তাংড়ে দিয়েছে খাতায়। কিন্তু আজ, ওহ, চোখ বুজলেই ঐ বরফ-ব্লু পায়ের গোছ! ভেসে উঠছে। রানী কি ওভাবে শুয়ে, এখনও। তার জোর ইচ্ছে, একবার ফিরে তাকায়। পারে না। এক অবিশ্লেষিত দ্বন্দ্বের লাগাম তারে রুখে রেখেছে যেমতি। অবিশ্লেষিত, কেননা, কাউন্টার-পার্টে শিরশির গোছের একটা অনুসংবেগও সে টের পেতে শুরু করেছে এরই মধ্যে। বস্তুত, এই প্রথম, রানীর অজান্তে রানীকে অনশ্বরা দেখতে চাইছে সে, রানীর লোমহীন পেলব জানু পেঁচিয়ে উঠে আসতে চাইছে তার, কমলের, যৌন-অনুকম্পাপ্রার্থী অন্যতম-একটি হাত।— এই চেতনাই তাকে ক্রমাগত গরম ও উত্তেজিত সুতরাং দ্রাবিত করে চলেছে।

কিছুক্ষণ। অপেক্ষা। নিস্তব্ধতা।

কমল আর থাকতে পারে না। দ্বন্দ্ব, আততি, প্রশ্ন, পাহাড়, মরা আত্মার পুঁজ সমেত হঠাৎই পাশ ফিরে রানীর দিকে তাকাল সে। আঁচল লাট খেয়ে বালিশের সাথে লেপটে। গম, জোয়ার আর কাঁচা বেসনে গড়া ঝানু বুকের একটি কালবোসের মাথার মাফিক বেসামাল বেরিয়ে। চিকচিক চিকন মিহি সুড়সুড়। ঠোঁটে ঝিনুক-ভরা লাস্য। সে ঘুমিয়ে নেই বেশ ঠাহর পেল কমল। আচ্ছা, একবার কি চোখ খুলে দপ করে তাকাবে, রানী? উঠে জল, কিংবা হিসির ওজরে একবার যদি ওঠে! ... একবার যদি এ-পানে চায়! একবার যদি জড়িয়েই ধরে! একবার যদি ... ...

সে-রাতে তুমুল ঝড় ওঠে। অজস্র শিলাবৃষ্টি, তারপর।

শাড়ির খসখস খুব কাছ থেকে শুনতে পেল কমল। তারপর ঢাকা সরাবার। প্রশ্বাসের আলট্রা পরশ। উরজের গুনগুনে তাপ। তালুর খরাদ। অনুভব করল কমল।

‘এই, ঘুমিয়ে পড়লে!’

নিশ্বাসের হিসহিস কানের লতির সন্নিকটে। কমলের সর্বা। কাঁটা দিয়ে উঠল। এই সেই মণিত রমণীকণ্ঠ যা হতে যোজনবর্ষ দূরে জন্মাবধি বধির হয়ে আছে তামাম মদ্দা প্রজাতি ...

‘বলছো না যে কিছু! বলবে না? এ্যাই—’

রানীর আশয় কমলকে চিৎবুক শোয়ায়। কমলও চায়। হয় না। কেন-জানি, তার চোখ খুলতে ভয়। খুললে, পাছে অন্ধ হয়ে যায়!

‘উঁ। ঘুমোতে দাও।’ সে শুধু বলল।

‘পরে ঘুমিও।’ মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দ্যায়, এবং গণ্ডভাগে চুমু। নাইটক্রিম-মথিত নিশ্বাসের সঘন ফোঁস: ‘তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছি, প্লিজ! বলতেই তো চাইছি। আর তুমি কী, বলো-তো! ভাল্লাগে না। এ্যাই—’

কমল আরও খানিক ভোগাবে বলে এখনও চুপ।

‘তুমি বলেছিলে, আমাকে নিয়ে কী-একটা লিখছো। সত্যি ...?’

রামো-রামো! মাঝরাতে বউ কী সূচনা করল দ্যাখো! এবার সরাসরি চোখ তুলেই তাকাতে হয় কমলকে। দ্যাখে, বউয়ের চোখ গনগন করছে। যেন ভিসেরা থেকে উঠে আসছে জ্বলন্ত লাভা। শরীর গরম, উত্তপ্ত। সে আরও তাতাবে বলে আরও-খানিক চুপ্পি সেধে থাকল।

রানী ওর বোতাম খুলে দিচ্ছে, পটপট।

‘বাবর এসেছিল! আজ?’ কমল দ্রুত হাত চেপে ধরে, ওর।

‘হুঁ। বিকেলের দিকে।’ ক্রমে ন্যুব্জ আনত বেঁকে রানীর গাল কমলের গালে।— ‘কিসে বুঝলে?’

‘না, মানে—’ কমল চিতিয়ে শুলো, রানীর মধ্যমা আর কড়ের নখর আদর পেতে পেতে বলল, ‘আজ পয়লা ফেব্রুয়ারি, রাত একটা পঞ্চান্ন বেজে আটচল্লিশ সেকেন্ড। এখন থেকে চার হাজার সাতশো ত্রিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ আট হাজার দুশো সাঁইত্রিশ সেকেন্ড আগে তুমি এইভাবে হাত বুলিয়েছিলে আমার বুকে। মনে পড়ে যাচ্ছে কিনা, তাই।’

‘সেদিন তো আর বাবর ছিল না।’ রানী আরও নিবিড়তার ঠেকায় আরও তেরছা মত হলো, এবং আপাত জড়িয়ে।

কমল ধূসর আলোয় ছোট্ট করে তাকাল। সে চাইছিল রানী ফীল করুক, কী বলে ফেলল আজ! রানী কিন্তু অমনি, বুকের লোমে বিলি কাটায় রত, তারতম্য নেই, ফের নেই। কমল বলল, ‘দ্যাখো, কোত্থেকে কোথায়। মদ আর লেখা, এই নিয়েই জীবনটা কাটিয়ে দেব যখন ভাবছি, তখন তোমাকে পেয়ে খানিকটা পজ খেয়ে গেলুম। লেখা থুয়ে, মদ ভুলে তোমার নেশাতেই কেটে গেল চার-চারটে বছর। তখন বই নিয়ে শুতে এসেছি ঠিকই, কিন্তু খোলা আর হয়নি। বদলে, প্রতিবারই ব্যস্ত হয়ে পড়েছি তোমাকে খোলার চাড়ে। শেষে প্র্যাকটিসটা দাঁড়িয়েছিল এই, যে, বই নিয়ে শুলেই তোমাকে দরকার পড়ত। সে ছুটির দিন দিনের-বেলাতেও হলে তাই হতো। কী, মনে পড়ছে? আর তুমিও কী সুন্দর ভাবে চলে আসতে, বলো! যেন অম্বিকার প্ররোচনায় দাসী অঙ্গনা!’

‘এইভাবে?’ ... রানী চোখ বড় বড় করে তাকায়। আরও কাছে ঠেলে দেয় নিজেকে।

কমল দেখল, সত্যি, তার হাত রানীর ম্যান্টলেট খুলে দিচ্ছে। জেগে উঠছে পঁচিশ-পেরনো নারীর প্রমাণসাইজ বক্ষপট ও তার বিউটি এনামেল। রানী কি এইসময় চুমু খাবে একটু? কমল ঠোঁট উঁচিয়ে ধরল।

সে-রাতে তুমুল ঝড় ওঠে। অজস্র শিলাবৃষ্টি, তারপর।

শায়ার কষি খোলায় প্র্যাকটিকালি সাহায্য করল রানী। আ, কতদিন পর একটি ভামিনীশরীর, পুরো। কমল ভাবল। এবং ফীল করল।

'শোনো' ... তদাবস্থায়, কী প্রাতিহারিক ক্ষমতায় কে-জানে, লঘু ও চপল গলায় রানী ডেকে উঠল। থুতনি তুলে কমল দেখল, তার চোখদুটিতেও কী চঞ্চল ও গভীর ক্ষেপ! কমলের ভেতরটা-অব্দি জরিপ করে নিচ্ছে যেন: 'ওই-যে তুমি সেদিন বলেছিলে না, আমি যার সঙ্গে ইচ্ছে, যা-খুশি,— কোরতে পারি! কথাটা কি তুমি খুব ভেবে বলেছিলে?'

একটা বেয়াদপ ঢেউ স্পিডে উঠতে গিয়ে থম মেরে গেল বেবাক।

'কী, বললে না যে! পারি?' প্রশ্বাস চেপে অপেক্ষা, রানীর।

'দ্যাখো, আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না,—' তবু বোঝাবে বলে রানীকে চিৎবুক পাড়ে, আর ঠোঁটের নিভিয়ায় নাক ঘষতে ঘষতে অবিকল আড়মাতালের গাঢ় স্বরে বলে, 'মদের গোলায় টান ধরায়, যীশাসকেও একদিন— এক পিপে জলকে, তাঁর দিব্যছোঁয়া মারফৎ তবদিল করতে হয়েছিল মদে। এ গল্প তুমি ইতিউতি কোথাও পড়েছো কিনা জানিনা। কিন্তু, প্রাণের মদ ফুরোলে লোকে হাটের মদের খোঁজ নেয়— এ তো তোমাদের সেই পোড়খাওয়া-দেড়েল কবিগুরুর কথা। মনের মদে যখন টান পড়ে, প্রকৃতির দেয়া জল ও কয়লার যথেচ্ছ ব্যবহারে যখন পৃথিবীর বুক শুকিয়ে— তখন আমরা আবিষ্কার আর বলাৎকারে মেতে উঠি, প্রকৃতির। মনের প্রাকৃতিক মায়ামঘরে যখনই টান পড়ে, তখনই আমরা মেতে উঠি শরীর নিয়ে। এ তো কোনো প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কথা নয়! তাছাড়া'— কমল গলার গ্রেন পালটে বলল, 'এ এক অদ্ভুত ফীলিং, কি-জানো রানী, কেউ তোমার বুকে হাত দিচ্ছে, চুমু খাচ্ছে, তুমি অপোজ করছো না, ভাল্লাগছে তোমার, আরও বেশি-বেশি পাইয়ে দিচ্ছো— খুব সামনে থেকে এই দৃশ্যটা দ্যাখা। সত্যি, অদ্ভুত ফীলিং এ। এটাকে আবিষ্কার কিংবা বলাৎকার, যা-ই ভাবো তুমি।'

'পারি, বলছো!' মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে রানীর শরীর। সবুরের আল ভেঙে ছিৎরিয়ে পড়ছে তোষা। অতি ধীরে ওর ভারি ঊরুযুগলের একটি ঈষৎ ফাঁক করে দিল কমল। তারপর বাঁকানো হাঁটুর একটি ফোল্ড খুলে নিজের ভাঁজ-করা হাঁটুর চাপে জমা রাখল। অন্য পা-টাও এমনি রাখবে ভেবে রানীর ক্লোমনলিকার উদান ফুরিয়ে এলো।

'দ্যাখো, আমি মোদোমাতাল হতে পারি, যৌনলোলুপ, পারভার্ট, সাইক হতে পারি। কিন্তু হিপোক্র্যাট না।' থাবার মোচড় জারি রেখে রানীকে তিতিক্ষার ফাগ-এন্ডে এনে দাঁড় করালো কমল, তারপর খপ করে জিগ্যেস করল, 'তুমি বাবরকে চাও, একবার খুব-করে চাও, তাই না?'

'আহ!' ... হঠাৎই শীৎকার খসে এলো রানীর মুখ থেকে।

'খুব ইচ্ছে করছে, খুব?'

'আহ ......'

শুধু চামড়া-মাত্র গায়ে বেহদ অ্যাপিটাইজিং পোজে নিজেকে স্ট্যান্ড-বাই রেখে শেষ 'আহ'-টুকু-স্রেফ রিলিজ করার তাড়নায় রানী।

কর্তিত বুনো-বৃক্ষের মাফিক নিজের সর্বা। আছড়ে দিয়ে কমলও শেষবারের মতো বলল, 'নাও কেড়ে যত সুখ, সুখৈশ্বর্য, শর্ম আর রভস। এই আমি স্বাধিকার ছেড়ে দিলুম ...'

সে-রাতে তুমুল ঝড় ওঠে। অজস্র শিলাবৃষ্টি, তারপর।

রানী দীঘায়, তাদের সেই মধুযামিনীর পর, আজ এই দ্বিতীয় দফা পড়ে-পড়ে মার-মাত্র-না-খেয়ে আশরীর উঠে দাঁড়াল। এবং ফণা তুলে।

তারপর, কেলানো কাপাসে জোলার জোর ধুনুরি পড়লে যেমন। ঢেউ ঢেউ ডেউ। শুধু ঢেউ। ঢেউয়ের পর ঢেউ।

আ, এহেন একটি অপ্রমেয় আপ্তিকে বরাতের উপচিতি বলে না-ভেবেছে, শেষ ঝরঝর মুহূর্তেও কমল ভাবতে পারল, এমন জিতাত্মা পুরুষ ইহলোকে আছে কি?

সত্যি, দাম্পত্য অঢেল আহাম্মকি এবং রহস্যের খেলা। চোর-চোর বেবুঝ খেলা। তদুপরি আজ হেঁয়ালি আর তার এই নামুঢালে এলিয়ে পড়া, তার ভাঁটা, তলিয়ে যাওয়া— এবং, তার হঠাৎ এরূপ ভুস-কেতায় জেগে ওঠা; তার ফ্লাড ও জলোচ্ছ্বাস! আমরা পার্টনারকে দোষল ভেবে খামোকা মনেরে নাকাল করি, ভারাক্রান্ত। দাম্পত্য, বা জীবন আসলে যৌনতা নামক এক অপরূপ মিথ্যের অফুরান ছলাকলা,— তার হদিশ খুঁজতে চাওয়া বৃথা। কেননা, এই রানীই যে-রাতে বালিশ হাতে ঘরে ঢুকে বলল, ‘এ বিছানায় কেন?’— মনে পড়ে, সেই ছিল ভ্রান্তপানের প্রথম পদক্ষেপ। কিংবা, এই ছলাকলার, তার পেছন হাঁটার, পদশব্দের সূচনা,— এমতও বলতে পারি। সত্যিই কি পিঠটান, পায়ের উলটো-চারণ ছিল সেটা? দাম্পত্যের এই সাত বছর, সাত-সাতটা প্রখর সন,— যৌনতা কি খুব-কিছু কম প্রসূত ছিল দীর্ঘকায় এই সময় জুড়ে? ক্বচিৎ, কখনো কোনো মন-খারাপের রাতে, বা ঝামরে, খেলার মাঝেই রানী ভেঙে ফেলেছে আড়মোড়া, অথবা জৃম্ভণ, কখনো-বা হালকা হাঁচন,— খুব কি অনাকাঙ্ক্ষা বা পাছগমনের কোঠায় পড়ে সেসব? না, রানী নয়। রানীই কেবল নয়। হয়তো সেই অদৃশ্য গ্যাপ বা স্পেস গড়ে উঠেছিল আমারই স্বারব্ধ অরুচি আর অনাকাঙ্ক্ষা থেকে, এক-নারীর প্রতি বৈরক্ত্য আর পর্যাবৃত্তি থেকে। রানীর দোষ বা অপারগতা যেটুকু, তা হলো, সেই দখলীকৃত স্পেস বিধ্বস্ত করার মতো যোগাড় বা এলেম তার ছিল না। সেটুকু কি নিছক ক্ষমার্হ ছিল না? আলবাৎ ছিল। ছি ছি, এ আমারই অপদার্থতা, আমারই বেয়াড়া রোখ। জীবনের সমস্ত, সব-ক'টা আশাই আমার এভাবে স্বীয় অব্যাহত আঘাতে ফিরে ফিরে, নিচে নামতে চাওয়া বেলুন, তার অনিবার্য ভারে, ক্রমশ জীবনের কেন্দ্রীয় কল্পমূর্তিতে আরও বিষাক্ত হয়েছে, আরও অবুঝ ও কর্মাক্ত,— আমারই ওজরে, আমারই পাপে।

সত্যি, মানুষ কখন আর কীঈ-যে ভাবতে পারে, ভাবে, সে এক মায়াবী বিস্ময়। উপন্যাসের শেষ পর্বটা কি তাহলে এই? কমল ভাবল। ভাবতে পারল।

পদ্মিনীর যে-মুহূর্তে শার্টের বোতাম ছিঁড়ে যাচ্ছে, আর গোঁফ

এদিন রোববার। রানী হঠাৎ এসে সামনে দাঁড়াল। 'বিকেলে একটু বেড়াতে যাবে?'

'অ্যাঁয়্যা—' কমল লেখার মধ্যে ছিল। জরুরি অংশ। চটসে বেরিয়ে আসতে পারে না। শেষ লাইনটা লিখে একটু মগজ দিয়ে পড়ে। তিনটে মূর্ধন্যর হাইট বাড়ায়। একটা সেমিকোলন, দুটো কমল রুজু। এক জোড়া ব্র্যাকেট ধ্বংস। ছোট্ট-করে একটা ঢ্যাঁড়া, ক্ষুদে হাইফেন। পুরো বেরিয়ে আসার আগে এটুকু। তারপর কলমটা স্ট্যান্ডের মধ্যে গুঁজে দিতে দিতে, দিয়ে, ভুরু টাইট করে তাকায়: 'আজই ডাকবো বলছো?'

'কাকে?' রানী আদপেই অবাক।

'বা রে! বাবরকে, আবার কাকে?' কমল আসলে ঐ পর্যায়ে কিছু লিখতে চাইছিল, বলল, 'আজ হলে আমারও খানিক রিলিফ। কাল সকালে উঠেই তালে শেষ এপিসোডটা লেখা হয়ে যাবে। বলো যদি, ডাকি।'

'ধ্যাৎ!' রানী ফিল্মি আইবুড়ির মাফিক সলজ্জ।

কমল পাতাগুলো স্ট্যাপল করে টেবিলের একপাশে সরিয়ে রাখল, 'আমি কিন্তু সিরিয়াসলি নিচ্ছি। শেষে তুমিই যদি বেঁকে বসো' ... সে বাকিটা চোখ মারফত বোঝালো।

'ইশ, আমার কেমন লজ্জা-লজ্জা করছে। আর ভয়।'

ভয় না। লজ্জা তো নয়ই। ওর গলায় নাচার অপরাধবোধ। এতদিনের ঘাঘু লেখক কমল সেটা বুঝতে পারল। সে উঠতে উঠতে বলল, 'বেশ, আরও ক'টা দিন তাহলে সময় নিয়ে করো।'

তারপরেও বলল, 'টেক ইওর ওন টাইম।'

সোমবার খুব ভোরে কমল দ্রুত একটা স্বপ্ন দ্যাখে। স্বপ্নটা ঠিক স্বপ্নের মতো। এমনিতে পাতি স্বপ্নগুলো যেমন বাস্তব মনে হয়, সেরম নয়। সে দেখল, লেট-দুপুরে বাবর খনি থেকে ফেরত। সর্বাঙ্গে কয়লাগুঁড়ি। গরিলার মাফিক কাঁধ, গা-ময় লোম, হাতের থাবায় থকথকে এঁটেল। আর খোমা জুড়ে হিংস্র কামানল। ফিরেই রানীকে নাইতে ডাকে। পাগলমতি মাইঠাল ভয়ানক তাথৈ বাধায় উভয়ের জলকেলি ঘিরে। ওপরের কামিজ ঘাড়ের তরফ থেকে খুলে জলেই ভাসিয়ে দেয় রানী। নিজের সালোয়ারও নামিয়ে দেয় ফাঁসগেরো খুলে। জলেতে খাবিক্রীড়া খেলে রাশরাশ কালো স্বাস্থ্যবতী চিকুর। হুটসে ডুব লাগিয়ে কিছুক্ষণ আন্ডারজল থেকে আবক্ষ-বাবরকে জলের ওপর রুদ্ধশ্বাস রাখে। তারপর, রানী ভুসচালে ভেসে উঠতেই, বাবার পেছন-বাগে পেঁচিয়ে গরিলার মতোই সজোরে চুমু ঢালে মুখে। বুকেতে হারামি পাঞ্জা ও তার নখর দাপট। এবং, আশ্চর্য, কমল দেখল, রানী বাধা দিচ্ছে না। উলটে আরও পাইয়ে-পাইয়ে দিচ্ছে। আর, ক্রমশ মরিয়া, খোদ। শেষ-দুপুরের রোদ আর বাতাসের জানলেবা সামারসল্ট তখন জোরসে, বাবলার গোপন শাখায় মুট-কোর্টের ক্লাশ বসিয়েছে ফাকতা কবুতরের জাঁবাজ ট্রুপ।

দুজনকে দ্যাখে, আর নিজেকে কেমন ঘটকর্পর লাগে কমলের। জেরবার। লুঙ্গিতে গিঁট মারা স্থগিত রেখে তক্তোপোশে গিয়ে সে সটান লুটিয়ে। বালিশের তলায় কী-একটা খড়খড় ঠেকে। কাগজ-কাগজ। দু-আঙুলে খুচলে বের করে সেটা। বাবর কিছু লিখে রেখেছে, একটা নোট। দুর্বোধ্য। সে কেবল 'র' পড়তে পারল, মাত্র।

যুগলে নাওয়া সারে। চারটে রুটি, পোয়াটাক দুধ, দুটো বাদামি তরমুজ। একটা মুরগি। চিবিয়ে খেল বাবর, একা। খেয়ে মশারির ভেতর। অন্ধকারে স্তনের ভিতর আত্মার ভিতর, ক্রমশ গভীর আঁধারে। বাবর, এভাবে দিন তিন-চারের বাড়তি বাইরে কাটালে দারুণ বুনো আর মাংসাশী হয়ে ফেরে। ফিরে, ফেরার পর, কমল

লক্ষ্য করেছে, সেদিনের সন্ধেটা, বিশেষত রাতের অনেকটা রানীকে জম্পেশ চায়। তারপর রাতভর তার ফেরাফিরি, এক দুই তিন ...। ওদের নামতার পর নামতা মুখস্ত করে যেতে দ্যাখে কমল। আর চিরনিকম্মার মতো সে তখন খোদ, নীরবে, কখনও ঝপাঝপ হাত মেরে চলে।

এটা একরকম রফা। যেন বাবর রানীর বিবাহিত। কমলের বিবাহিত রানী। রানী ও বাবর আমার। আমি রানীর। রানী বাবরের। কমল রানীর। আমি কার—? কমল দুঃস্বপ্নে ঠিক ধরতে পারে না, কে এই শুয়োরের বাচ্চা 'আমি'? কমল হয়ত উঁকি তুলে ও-দুজনকে দেখতে চাইল, তখন বাবর পুনরায় সুর করে জীবনানন্দ — 'স্বরের ধ্বনিরা এসে বলে যায়: স্থবিরতা সব চেয়ে ভালো' ... এদিকে রানী ঠিক আমার তলায়, দু'চোখে ভরন্ত জল, আহ, ওহ, ওঃস, ওহোহোহোহো-হুশ ...। হঠাৎ নিদ্রা ভেঙে যায় কমলের, উঠে দ্যাখে পাশের বেড খালি, পাশে বাবর নেই, পাশে রানী নেই, পাশে তুতুল নেই ... উফ!

ভৌমবার কমল ঐ স্বপ্নের কপি শোনায় রানীকে। 'দাঁড়াও, দাঁড়াও'— রাতের রূপটানে কাবু ছিল রানী, সঠিক মগজ দেয়নি। শেষে, কাপড় ছেড়ে, বিছানায় এসে, সটান-বুক বাবু হয়ে বসল কমলের পেটে।— 'হ্যাঁ, এবার বলো।'

কমল গোটা স্বপ্নটা রিপিট শুনিয়ে, শেষে ওকে শোনায়— 'স্থবিরে চোখে যেন জমে ওঠে অন্য কোনো বিকেলের আলো ...'

রানীর দু'চোখ চুঁয়ে জল। কাঁদছিস কেন! কমল জানতে চায়, রানী, কাঁদছো কেন? মেয়েরা কীজন্য কাঁদে! কাঁদেই কি? নাকি এ কান্না নয়। অন্য কিছু।

রানী চুপ্পি মেরে। শুধু গড়াতে দেয়, জল। আ, আজ বহুদিন আগে এই শরীরে থুতু দিয়ে সাঁটিয়েছিলাম অচেনা-অজানা মুলুকের সব ডাকের টিকিট, এতকাল বাদে রিডাইরেক্ট হয়ে ফিরে ফিরে আসছে সেসব। সে হঠাৎ রানীকে দু-বাহু শক্ত বেড়ে জড়িয়ে-ধরে বলল, তুমি পাবে। যা চাও তুমি পাবে। আর একটু সবুর শুধু। তুমি সব পাবে ...

রানী প্রায় কেঁদেই ফেলল, পুরো।

বুধে পা দিয়ে রানী দুম করে জানতে চেয়ে বসল, 'আচ্ছা, সবকিছুকে তুমি ঐ একটাই খাতে নিয়ে যাও কেন বলো তো?

'কোন খাতে?'

'তুমি জানো।'

'ঐ একটাই তো খাত দুরুস্ত আছে রানী। বাকি তো সব পচা-হাজা।'

রানী ফের শোধায়, 'আচ্ছা, ঐ-যে তুমি বলেছিলে, সেক্স কি সত্যে পৌঁছোনোর পথ? তুমি কিভাবে চাইছো বলো, আমি চেষ্টা করব। আমারও থেকে-থেকে কেমন মনে হচ্ছে, এ যেন আমি বুঝছি না, আমি কী চাই। তুমি ভেবে রেখেছো কিছু?'

কমল ওকে এক-পশলা আদর করে দিয়ে বলল, 'আমি জানি না, সত্য কী। তার ঘাঁতঘোঁতের কথা বলতে পারি মাত্র। কিন্তু দ্যাখো, আজ বাদে কাল নতুন পুরুষ লাভ করবে তুমি। নতুন অভিজ্ঞতা। কিন্তু অভিজ্ঞতাটা হবে স্রেফ শরীরের। মন তো থাকবে সেই কুসুমের কাছেই। ও নিয়ে অতশত ভেবে কাজ নেই। বেশি ভেবো না। মন খারাপ নিয়ে অন্য পুরুষে যেতে নেই। ওতে পাপ। তুমি বরং বেশ খাওয়া-দাওয়া করো। ঘুমিয়ে-টুমিয়ে নাও, বিলকুল ফ্রেশ থাকো। এক্কেবারে মিনিংলেস ভালো, থাকো।'

বেস্পতিবারটা তাদের এমনি গেল। রানী খোদ বাজার থেকে মা-লক্ষ্মীর ঘট এনেছিল, খুব ঘটা করে পুজো সারল। ওপাশে কমল সারাদিন ভেবে ভেবে কাটালো কীভাবে শেপ পাবে পুরো ব্যাপারটা। অর্থাৎ, শেষের সেই রাত্তির। না, এ-পর্যায়ে সার্ত্র কিয়ের্কেগাদ হিটলার কিংবা নিৎসে কোনো মদতে এলো না।

এরবাদে বাংলা বা বাঙালির বাই আছে এহেন আর কোন ভাষায় কেউ কিছু লিখে রেখেছে কিনা দেখতে গিয়ে দেখল, ধ্যুউস। এ-ভাষায় সব-ক'টা লেখকই প্লেজিয়ারিস্ট। অন্যের ভাবনা টুকলি না করে এগোতেই পারে না। অন্য ভাষাতেও কেউ কোৎথাও নথি রাখেনি, একফোঁটাও। ... এরপর সে ভেবে কাবু হয়ে পড়ল যে কী ভয়ংকর, বিপজ্জনক, স্বাধীন আর প্রাতিস্বিক স্টেপ সে তুলতে যাচ্ছে! কী অদ্ভুত তার নিদিধ্যাস! সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের সংবিধান-ব্যাখ্যার মতো গুরুতা যোগে সে মাত্র এইটুকু আবিষ্কার করতে পারে, যে, এমন একটা কাজ সে করতে যাচ্ছে যার কথা কেউ, আগে, কোথাও, লিখে রাখেনি এবং সে প্রথম লিখতে যাচ্ছে— এই চিন্তা তাকে ভয়ানক খেদিয়ে মারলো গোটা গুরুবারটা।

জুমার দিন একটু বেলাবেলি ফিরে কমল ভুরু প্লাক করে দিচ্ছে রানীর, মনে করিয়ে দিল — 'দ্যাখো, ভুল বুঝবে না। আমি কিন্তু একবার বলেছি। মিন্স, একবার। ব্যাস। অন্য কিছু না।'

'অন্য! কিছু?' মুণ্ডুমাত্র প্যান করে বেধড়ক তাকায় রানী।

'হ্যাঁ, মানে, এই ধরো, প্রেম।'

'প্রেম!' সত্যিই প্রশ্নার্থী করে দিয়েছে কমল, ওকে।

'অই তো'— টুইজার-সহ তালু উলটে কমল বলল, 'জানি, ব্যাপারটা তুমি অ্যাডমিট করতে পারবে না।' এবং এরপরেও মুড দুরুস্ত রাখার যথেচ্ছ স্কোপ জিইয়ে রেখে বলল, 'তুমি তো আর বেয়েশ্যা নও। জানি, তোমার সেক্স-পেরিফেরিতে ওরকম একটা ধেড়ে মরদ থাকলে তোমার বায়োলজিকাল হাজমা চাঙ্গা থাকে। কিন্তু এনিগমাটা হলো, শুধু সেক্স দিয়ে তো পুরো ভাতটা মাখা যায় না। তাজ্জন্যে মুলো-বেগুন-পালঙের একটা ঘ্যাঁট অন্তত লাগে। মানে, ঐ যাকে প্রেম বলে আর-কি। শোনো'— প্রয়োজন না-থাকা সত্ত্বেও গলার স্বর পর্দা-দুই নামিয়ে দিয়ে কমল বলল, 'লোকে যাকে ইলিসিট রিলেশান বলে, বা ফরবিডন লাভ, সেরম কিছু দরকার নেই আমাদের। অন্তত আমার নেই। ওতে অশান্তি বড়। কিন্তু একদিনের জন্যে সেক্স হলে তোমার মন, স্বাস্থ্য, আর যা-যা, ভালো থাকে যদি, ক্ষতি কী? এই ভেবে'—

শেষে ঐ হারামি শনি এবং তার পুশিদা জগঝম্প।

আজ যেন একটু হিম হয়ে আছে রানী। সকাল থেকে। অফিস ফেরত কমল এসে দেখল, জমাট ভাঙেনি।

'আজ তো বাবর আসার কথা।' জুতোর লেস খুলতে খুলতে কমল বলল, 'তুমি তৈরি তো?'

'আজ কেমন ভয় করছে।'

'ভয়!'

'হুঁ। পরে যদি চিট করে!' একটু থেমে,— 'অ্যাই! তুমি ওকে ভালো করে চেনো?'

'চিনবো না মানে!' কমল বলল, 'ক্লাশ টু থেকে একসঙ্গে। করেছি কত কী। ও আমার সব জানে, তোমারও। তুমিও তো সেটা জানো। দাঁড়াও, মাকড়াকে একটা ফোন মেরে আসি। আর শোনো'— সে আরও বলল, 'তুমি স্লিভলেসের বদলে আজ ম্যাগিয়া হাতা পোরো। বাবরের ফেবারিট। আর, চুল বেঁধো না, এমনিতেই তোমার কম। টিকটিকির ডিমের মতো বড়জোর ছোট্ট-একটা টিপ পোরো, ব্যাস। বেশি ঝুটঝামেলায় কাজ নেই। তাতে ডাউট করতে পারে।'

'তুমি কিন্তু বেশি খেয়ো না।' রানী পায়ে-পায়ে বেরিয়ে এসে বলল, 'খেলেই তুমি খুব চেল্লামিল্লি করো।'

'অ্যাই দ্যাখো, পাগলকে বলে সাঁকো নাড়াসনি যেন!' কমল হাসতে চেয়ে বলে, 'মাইরি! আমি তো ভুলেই গেছিলুম। কিচেনে একটা হাফ আছে না? থ্যাংক যীশাস। বের করে রাখো তো! করেই রাখো।'

বৃত্তান্ত। এইখান থেকে ঠিক হবে কোনখানে গিয়ে ড্রপসীন

সে-রাতে ঠিক কী ঘটেছিল, সেটা বলছি।

লেট ইভিনিঙে কমলের ফোন।

'হ্যালো! বাবর?'

'হু'জ স্পিকিং?' প্রথমে চিনতে পারি না— 'হু ইজ ইট প্লিজ ...?' তারপর ভোল্টেজ কমে যেতে যেতে দপ করে জ্বলে ওঠার মতো: ...'ইজ ইট অ্যাড়া? গলার কী করে ফেলেছিস মাইরি! কাঁদছিলি? ক্যামন ফ্যাস-খ্যাস লাগছে। এনি প্রবলেম? উপন্যাসের কদ্দূর? হোয়্যার আর ইউ?'

'সামহোয়্যার ইন দ্য ডার্ক।'

'নো মস্করা প্লিজ, করিস না—'

'গ্রিন লেবেলের একটা হাফ বাটলি লাগবে। আর তুই।'

'এটা কত নম্বর ভূত?'

'একটা ক্রাইসিস সাডেনলি ডেভেলপ করেছে। আটকে আছে, হাপিস করতে পারছি না।' কমলের গলা সত্যিই ফেঁসে গেল,— 'তুই ঠিকই বলতিস, সব কিছু স্রেফ থ্রু-অভিজ্ঞান দিয়ে লেখা যায় না। সলিড অভিজ্ঞতাও লাগে কিছু। তোকে এখন খুব দরকার বাবর। তোকে না পেলে লাইনে মাথা দেব। এখুনি আসছিস?'

সে-রাতে ঠিক কী ঘটেছিল, সেটা বলছি।

প্রত্যাসন্ন আবিষ্কারের আগে বৈজ্ঞানিকের তৃপ্ত হাসি জেগে উঠতে চাইল কমলের ঠোঁটে। এভাবে জেনে বা না-জেনে, এরপর কী, পরাকাষ্ঠার তুঙ্গে পৌঁছে যেতে চাইল সে, উপন্যাসের।

আজ কি পূর্ণিমা?

টেলিফোন বুথ থেকে বেরিয়ে সংক্ষিপ্ত সর্পিল অন্ধগলি ছাড়াতেই কমল দেখল আকাশে একখণ্ড মেঘ নেই, আলোয় ভেসে যাচ্ছে চাদ্দিক। পড়শি বাড়িগুলো অন্ধকারের তোড়ে ব্যস্ত, সমস্ত কপাট বন্ধ, কেউ নেই তাকিয়ে দেখবার। শুধু, একা ফাগুন চাঁদ অপলক চেয়ে।

বাড়ি ফিরে দেখল, এই কুড়ি মিনিটের ফাঁকতালেই রানী সেজে ফেলেছে অনেকখানি। নীলে নীলাক্কার করে সাজিয়েছে নিজেকে। নাবিক-নীল শাড়িতে ধূপছায়া রঙের অ্যাপ্লিক। টারকোইশ ব্লু ছিটের ব্লাউজ। কোবাল্ট-ব্লু বিন্দি। ময়ূরকণ্ঠী নাকছাবি। তার-বাদে, সূক্ষ্মভাবে একটু বেশিই মেকআপ।

বেডরুমের অপ্রশস্ত নীলাভ আলোয়, টানটান পাতা দুধেল বিছানায়, পিঠমাত্র সোজা, হাঁটু মুড়ে, খোলা-চুল আনত মুখে ম্যানিকিওরের শেষ টান সারছিল রানী। এখন এই মুহূর্তে ভীষণ ঝড় চলছে ওর মনে, কোন এক অজানিত তাপে ভেতরে-ভেতরে ভয়ানক ঘেমো আর কেঠো হয়ে যাচ্ছে, কমল বুঝতে পারল। তবু, চোখের তড়ে, তারা-দুটিতে কেন-জানি কামনা আর লাস্য যোগানো চাউনি, যা সে প্রথম অন্তর্বাস মোচনের কালে, আজ থেকে সাত বছর আগে একটি বার মাত্র দেখেছিল। ঈষৎ আড়াআড়ি ঝুলে থাকা ঠোঁট-জুটির ফাঁক গলে আবেগের রক্তিম থিরকানি। আ, এতখানি আরক্ত-আলোময় রানীকে আগে কখনো দেখেনি কমল। প্রাক্তন তিন বছর জুড়ে, অন্তত, এই রানীকেই তো সে পেতে চেয়েছে খুঁজে।

রানীর এরূপ স্বতোস্ফূর্ত আরক্ত-আবেগ বহুদিন আগে অবশ্য দেখেছিল কমল। দেখত। প্রথম, যেদিন কমল ওর হাঁটুতে মাথা গুঁজে অসহায় কেঁদেছিল। তারপরেও একদিন, কমলের রোজনামচা পড়তে পড়তে

চলেই গেছে অরগ্যাজমে। হ্যাঁ, অরগ্যাজমে। কমল লক্ষ্য করেছে স্বতোস্ফূর্ত ও অচেতনভাবে বিহ্বল হলেই রানীর চেহারাটা, একরকম, অদ্ভুতভাবে পালটে যেত। সুন্দর-কিছুই, যা রসময়, তাকে এরকম বেসুধ বেপোট করে ফেলত। জাগতিক যা-কিছু কেবল কল্পনায় ছোঁয়া সম্ভব, অথবা নিরূপম কণ্ঠস্বর বা বাগভঙ্গি কিংবা জীবনানন্দের লাইন, উপমা— এসবই তাকে পৌঁছে দিতে পারত শিহরণের এক অস্পৃশ্য চুড়োয়। যদি তাকে সুন্দর করে বোঝানো হতো কী-ভাবে রঙ বদলায় সেলটিপ ফিশ, অথবা অক্টোপাসের রক্তের রঙ নীল কেন, কিংবা জোনাকির পিছে কেন লুসিফেরিন, কি, অতলান্তিকের আছোড় পাল-তোলা নৌকোর বৈঠায় বেধড়ক রমণীরমণ— তাহলে, কমল খেয়াল করেছে, রানীর অধর জুড়ে কাঁপ ধরে যেত অতীব তিরতির,— ঈশ্বরীর মতো অনুন্মেষিণী হয়ে চোখ দুটি,— তখন কী শুনছে, কী বলছে, কাকে, খেয়াল আর কিছুই নেই ... পার্থিব-সব ধরতাই-এর বাহিরে এক গভীর অতল অজানা তন্ময়তার মধ্যে সে ক্রমশ তলিয়ে তলিয়ে তলিয়ে ...

আর, প্রত্যেক দফাই, রানীর এরূপ সজাগ অথচ প্ররোচনামূলক-চালে অরগ্যাজমে চলে যাওয়া কমলের চেতনা ও প্রশ্বাসকে ক্ষতই শুধু দেয়নি, উপরন্তু ডাঙায় নোঙর করা জাহাজের মাফিক এক ক্লীবত্বসূচক মর্ষকামেও ভুগেছে সে। জলে নামার ক্ষমতা তখন হারিয়ে।

আজও, দূর থেকে কমল দেখল, ধবল-ধূসর নীল অন্ধকার শয্যায় পরপুরুষের নির্বাসা বুকে নিজের নিভিয়া ও নিজেকে ঘষবে বলে, তার নুয়ে-পড়া মুখের কাছে, নীলচে ফ্লুরোসেন্টের মতো ধ্বকিয়ে জলছে শুধু একজোড়া বৃন্ত। সেখানে কোনো নভাক নেই।

'রানী! রানী!' সে বার-দুই ডাকল, বা আড়াই।

'অ্যা-অ্যাঁ—?' রানী নিজেকে ফেরত পেয়ে চমকে তাকাল।

'ভাবছিলে কিছু? ভাবছিলে, বাবরের কথা?'

'ইসস।' ব্রীড়াভরে, ঠোঁট না তেরছিয়ে, মাত্র আলচা-চোখে স্লাউচ করে তাকায় রানী। যেন, শেষ স্পিডি-কালখণ্ডে জরিপ করে নিতে চাইছে কমল ও কমলের সিদ্ধান্তকে।

কমল লুকিয়ে ফেলার মতো ছোট্ট এক কণা হাসি হেসে বলল, 'প্লিইজ, বলো।'

'দ্যাখো—' চোখভর্তি শানানো ছুরির গোছাও গুছিয়ে নিয়েছে রানী, এরমধ্যে, তারই একটি ঈষৎ ছুঁড়ে মারে এবং তদুপরি আর্দ্র-টার্জিড মুখত্বক সামান্য জড়ো করে, তৎসহ ঝুলন্ত অধরটি খানিক ওপরে খিঁচে, সে বলে, 'আমার মন বলছে পুরো ব্যাপারটাকে তুমি খুব সহজভাবে নিচ্ছো। নিচ্ছো কিনা, বলো!'

হাই-লা! বউ বলে কী? কমল সত্যি অবাক না-হয়ে পারে না, এবং হয়। কেননা, এহেন কালবেলায় প্রশ্ন ও দ্বন্দ্বের তামাম প্লজিবল চাঁইচুকুর তো একুনে অবান্তর। বোতামের পর বোতাম হাত ঝরাতে ঝরাতে হঠাৎ থেমে যায় কমল। তার ভুরু দুটিও ফ্রেম ছেড়ে কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে : 'এ তুমি কার কথা বলছো রানী, নিজের না আমার? আমার যদি হয়, আমি সেই বাউল ঠাকুরের কথাই রিপিট করব। নারী বা পুরুষ যখন যার সঙ্গে থাকবে, সে-ই তার সুখ, সাধনা আর সঙ্গী। ঘরসংসার, সুখী গৃহকোণ, স্বামী-স্ত্রী, দাম্পত্য এসব এক-একটা আরোপিত, বানানো, মিথ্যে ঘটনা। উভয়েই সারাজীবন ভিক্কে করে খায়। নারী যা চায় তা পায় না। পুরুষ যা চায়, পায় না। আর সারাটা জীবন, এভাবে, আকাঙ্ক্ষিত সুখ, সুখৈশ্বর্য, শান্তি আর ভালোবাসার স্বপ্নাশা নিয়ে একদিন কুট করে মরে যায়। পয়সা হজম।'

'প্লিজ, বুঝতে চেষ্টা করো কী বলতে চাইছি আমি'— ঠোঁট দুটি মৃদু কুঁচকে যায় রানীর : 'তুমি যে-ধরনের চিন্তাধারায় বিশ্বাসী, আমি জানি, তোমার মতো খুব কম মানুষই ভাবতে পারে। কিন্তু তুমি নিজের কাছে কি ক্লিয়ার, যে, তুমি কী! এ কি তোমার সত্যের দিকে ছুটে যাওয়া, নাকি মৃত্যু!'...

পিঠের দাঁড়া বেয়ে একটা বরফ-শীতল কাঁকলাসই যেন নেমে গেল দ্রুত। উফ। এই শঙ্কাটাই চাপা আর অনুক্ত থেকে যাচ্ছিল মনের তলাটে। এই অব্যক্ত ভীতিই সাড়ে ছ'দিন ধরে অবচেতনের তলপেটে গভীর ঘুরপাক খেয়েছে। রানীর সদ্বন্দ্ব-প্রশ্ন জাগরণের শেষ কিনারায় এনে ফেলে কমলকে, এবং প্রতিরোধহীন।

সে আরও ভেবে ফেলছিল, ত্বরিতবেগে, যে এমন-একটা তদন্তমূলক আর বেসুরো পদক্ষেপ সে তুলতে যাচ্ছে, এরপর কোনো পরিচ্ছেদ থাকবে না, অথবা পোস্টস্ক্রিপ।

এবং, মৃত্যু বিনিশ্চিত।

এবং, থাকেও যদি বেঁচে, তো সেই বাউলের প্রেক্ষিতেই মূল্যায়ন করে কাটিয়ে যেতে হবে জীবনের বাকি লাইনগুলো। এবং, সেখানেও মল্লিনাথ বা ফুটনোট থাকবে না কোনও।

রানী, আমি চাই না আমার এই ভয়ঙ্কর উপন্যাসের আবিষ্কার কেউ জানুক। কেননা, তুমি ঠিকই বলেছো, ব্যাপারটা আদপেই অত সহজ বা মসৃণ নয়, যতটা পূর্বে ভেবেছি। কেউ জানলেই কলুষিত হবে এর নিদাগ পবিত্রতা। এরপর তুমিও বিপন্ন, বিপন্ন আমিও। সেই-যে বাতাস আক্রমণের গল্পটা গো।— বাতাস অতিষ্ঠ হয়ে বলল, খা, খেয়ে মর! হায়-হায়, শিস উড়ে যাচ্ছে গমের, আঁধিতে চান্ধার লোপাট। এখন মুখ থেকে বাতাস এনে কেমনে বাঁচাই তোরে বলতো! ... জানি, এরপরেও একদিন শেষবারের মতো যৌনগমন চাইবে তুমি। এবং দিতে আমি অপারগ হবো না। এবং তোমার ঘনবদ্ধ কেশজাল দু'পাশে সরিয়ে, তোমার শুচিস্নিগ্ধ মুখপাত্র দু'হাতে ধরে, তোমার ওষ্ঠ ও অধর আধাআধি দু'ফাঁক খুলে, নিঃশব্দে ঢেলে দেবো কীটঘ্ন কাকোল। ...

সে-রাতে ঠিক কী ঘটেছিল, সেটা বলছি।

চাঁদ সে-রাতে অনেকখানি আলো ছড়ায়। শহর গড়াতে-গড়াতে কমলের বাড়ি অব্দি। তারপর নির্জন শূন্যতা। দূরে, বহুদূরে ছড়ানো নিষ্পত্র পাথুরে জমি, বুনো ঝোপঝাড়, জঙ্গল আর খামচা খামচা খেত-নালা। আরও দূরে, দিগন্তধারী সবুজকালো তরঙ্গবহুল টিলার নির্বিদার জিগজাগ। সব ভেসে যাচ্ছে আলোয়।

বাড়িটা দ্বিতল। নিচেটায় বহুদিন মেরামত না-হয়ে ক্ষয়া বুড়ো। ওখানে একদা সজল থাকত। সজলের বৌ আর মেয়েটি। ওরা ধানকল পার হয়ে চলে গেছে। এখন পরিত্যক্ত। নিচের সমগ্রটা আজ আগাছা আর ফাঁকায় ভার। বাড়ির পেছনে থকথকে সবুজ পানা। কেনার সময় যা-যা দেখে ভালো লেগেছিল কমলের, তার মধ্যে নিঃসন্দেহে এই হরিৎ নৈরাজ্য আর জরুরিসম্মত নির্জনতা। কমল এখন ওপরে, স্বনির্মিত দু-কামরার ছোট্ট দখিন-খোলা বাড়ির বাসিন্দা। বন্দোবস্তি তার নিজস্বতা মাফিক। একটি ডাবল বেড, দুটি চেয়ার কোনো-মতে। ছোট্ট লাগোয়া বাথরুম। নিঃস্ব। কমোড ও শাওয়ার। এ-ভিন্ন, কচিমতন কিচেন, একটি। আর, বাড়ির লাগোয়া অনেকখানি আমুদে ছাদ, প্যারাপিট বাঁধা। কোণে, রানীর বিখ্যাত পুষ্পারাম।

কমলদের শোবার ঘরে আমি বহুদিন পর, পজ দিয়ে। সাজানো আলো, নীলচে। খোলা জানালা ফুঁড়ে ফাগুয়া বাতাস। ডিভানে দুধেলা বাহার। তুতুল ঘুমিয়ে। বাই-দ্য-ওয়ে, ইদানিং যে-দফা এলুম এ বাড়ি, এই ক্ষুদ্রকায় দুরন্ত প্রাণীটিকে ঘুমেই দেখেছি সদাব্যস্ত। গুগ্গা-গুগ্গির ক্লান্তিকর প্রাত্যহিকতা কিংবা মাঝদম্পতির দাপহারী অ্যাডভেঞ্চার, দুটির কোনটিতেই তার সেই জাগ্রত গবেষণা নেই। সে এ-কাহিনীর নিদ্রিত শরিক মাত্র।

যাই হোক। বিছানায় দুধেলা বাহার। স্বচ্ছ কাভারলেট। গণ্ডোপধানে রজনীগন্ধার সতেজ ডাঁটি। দশটা-টশটা হবে। দশটাই। পাওয়ার হাউসে গজল বাজছে, হালকা।

চটির আওয়াজ পেয়েই ভেতর থেকে হেঁকে উঠল, 'অ্যাই! আ গিয়া মেরা পার্টনার। রানী ডার্লিং, আউর একঠো গিলাস লাও—'

পর্দা ফাঁকিয়ে দেখি, ব্যাটা আগে-থাকতেই চালু আছে।

'আজ রাতের তুই রাজা।'— বাঁ হাতের মোচড়ে কড়কড়িয়ে ছিপিটা খুলে, ছিপিটা একধারে রেখে, কমল বোতলটাকে শূন্যে তুলে ধরল: 'এই যে দেখছিস, এই সুরা, এই শয্যা, এই নারী, এই চাঁদ আর ঐ যেখানে ধাঙি পাহাড়ের উদলা ছাতি, ঐ পর্যন্ত আমার এমপায়ার। এ-সবই আজ তোকে দিচ্ছি।'

দেখলুম শুধু চালু যে, তাই নয়, আগে-থাকতে আউটও হয়ে বসে আছে। আউট হলে দেখেছি, এরকম আলফাল সে বরাবরই বকে মরে। সে মরুক। আমি রানীর মুখের দিকে তাকালুম। অপ্রশস্ত মেকি নীলাভ আলোয়, টানটান কাজোলি চোখে, স্পর্ধিত বুক, গোড়ানো গ্রীবা, তোলা পাছা, খোলা চুল, আনত মুখে দু-গাছি জশমের মিহি ঝিনঝিন সহ আমাদের জন্য শসা কেটে দিচ্ছে, আর পেঁয়াজ। ভারি অয়েলি আর অলীক দেখাচ্ছে আজ ওকে। অবশ্য, এমনিতে, গুমশুদা মাইন বেছানো আছে ত্বকের সর্বত্র। অল্প বিলি কেটে দিলেই, বিস্ফোরণ।

বললুম, 'ভালোই তো। নে, ঢাল।'

'না-না'— কমল বলল, 'তোকে আজ এসব ডোনেট করব বলেই ডেকেছি। মাইরি, বিশ্বাস কর।'

বলে, সে রানীর মুখের দিকে তাকায়। ইঙ্গিতবহ। তারপর, আমার দিকে। মাতালের মতোই মুড়ি ডোলায়। তারপর নাইটল্যাম্পের অস্বচ্ছ আলোর দিকে গেলাস ধরে একাগ্র মনে হুয়িস্কি ঢালে, সমান মাপে। তারপর বোতলের ক্যাপটা অমনি পেঁচিয়ে, গ্লাস তুলে ধরে শূন্যে— 'চিয়ার্স! চিয়ার্স ফর আওয়ার বাবর শ্যেন!'

আমি খানিক লজ্জা পাই। গোঁফের হেপাজতে দাঁত গিজুড়ে হাসি। রানীকে দেখলুম জানালার গ্রিল ধরে বাঁকা-কোমর দাঁড়িয়ে কনকনে চোখে আমার দিকে চেয়ে। একটা গরমামুলি হাসিও নিজস্ব ভাষায় বিচ্ছুরিত। সে-হাসি এমন যার প্রতিটি বিচ্ছুরণে আগের সব বিচ্ছুরণ বাতিল, প্রতিটি প্রবহমান বিচ্ছুরণে নিক্ষিপ্ত তার প্রতিবিচ্ছুরণ।

'বাবর, আমাদের সেই পুরনো পাড়াটা মনে আছে তোর?' কমল গ্লাসের অর্ধেকটা এক লপ্তে ফাঁক করে দিয়ে শুরু করল,— 'সেই, খাতে খাতে বহতা নালা, মাঠঘাট, হোগলার বন! আর জরুরি যেটুকু সরু আঁকাবাঁকা গিরিপথ! আমি তখন আমার ভুল মা-বাবা আর ভাঙা সম্পর্কগুলোর সঙ্গে থাকতুম। বাবা ছিল জাগরীর বিলুর মতো। নম্রবাক, দৃঢ়সহিষ্ণু, বাঙালি বড়ছেলের আর্কিটাইপ। কখনো ঘুষ নিত না। মা ছিল ভয়ানক মুখরা। জলে দুধ মিশিয়ে বাবাকে দিত। আর, পিওর দজ্জাল। আমাদের বাড়িটাকে নষ্ট করে দিলে।'

'মাল-হাতে ওসব কী আরম্ভ করলি!' আমি প্রস। বাঁকাবার চেষ্টায়,— 'তোকে তো কোনদিন তোর ফ্যামিলির লাফড়ায় পড়তে দেখিনি। যখুনি গেছি, তোকে দেখি, একা-একা বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে।'

'হ্যাঁ।' কমল পজ নিয়ে বলল, 'আমাদের পাড়ার পেছনে ছিল আরেকটা প্রহিবিটেড পাড়া। আমরা জানতুম লালকমল-নীলকমলদের দেশ। ও-পাড়ার ছেলেরা আমাদের পাড়া মাড়াতো না। কিন্তু তুই মাড়াতিস। কেন মাড়াতিস, বাবর?'

'তোর সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াবো বলে। তোদের চিলছাদে চড়ে ছাড়তুম। মনে আছে? আমারটা আগে গোঁত্তা খেয়ে পড়ত। এই আস্তে, তোর হাত টলছে।'

'হ্যাঁ। এছাড়া তোর সঙ্গে আমার খুব-একটা বেসিক ডিফারেন্স ছিল কি?'

'ছিল। আমি তখন বিনাকা-সিবাকা ধরেছি, তুই তখনও ঘুঁটে-ছাই আর নীমদাঁতনে।'

'আর?'

'আমার হাতে জিওমেট্রি বক্স। তোর হাতে দশ পয়সার কংরেসি নিরোধ।'

'হ্যাঁ, আমি তখন ঐ জোড়া-বলদ আর বেলুনেই বুঁদ। আর কমলা-মালতির নারিয়েল চুল আর চুড়ির ঠিনঠিনে। তুই কখনই ওসব চক্করে পড়িসনি। তোর বাবা ডেপুটি, মা মিস্ট্রেস। তোদের গাড়ি, রবীন্দ্রসংগীত। গেটে কুকুর। তোদের কেউ মেড়ো বলত না।'

'তবু'— আমিও একটু আবেগে জড়ালুম,— 'তোর জগৎটাকে আমার হেবি লাগত। আমাদের চেনাজানা তামাম শাশ্বত জীবনধারা থেকে নিজেকে পুরোপুরি ডিট্যাচড করে একদম নিজের মতো এক পাগল জীবনচেতনা গড়ে তুলতে গেছিলি তুই। তখন থেকেই টিকটিকির ঠ্যাং চিবিয়ে খেতে পারতিস, হেলে সাপের শিক-কাবাব,— কোয়ালিটেটিভলি তুই ছিলি অনেকের চেয়ে রিমার্কেবলি আলাদা। অন্তত আমি যেটুকু বুঝি তোর রিটার্ন পৃথিবী একদিন দেবেই। আজ না হোক, যেদিন ধুলো ঝেড়ে সিডি কি সেলফোনে টেগোরের সং

শুনবে তোর নাতি, কিংবা পুতি, আর অবাক হয়ে ভাববে কী দিয়ে লেখা হতো এসব! সেইদিন। সেইদিন তোকে নিয়ে রিসার্চ। যে, কে এই খচ্চর দি গ্রেট কমল চক্কোত্তি, কী ভেবেছিল সে? কী পেতে চেয়েছিল খুঁজে! এইসব ভুষিমাল লিখে কী পেয়েছিল সে? কেন? কিভাবে? আর ...'

'থামলি কেন! এত চালাক ধূর্ত ধাউড় তুই? বাবর, বাপ আমার! তুই আমাকে এতখানি, এত পার্সেন্ট বুঝিস? কই, তোর চোখমুখ দেখে ধরা যায় না তো! তালে বল, কী ভাবছি এখন, এই মুহূর্তে। কী করতে চলেছি, বল। কোন ফিকিরটা আমার মাথায়। বল না! তোকে বলতেই তো বলছি। মানুষ সবচে মুগ্ধ হয় কখন জানিস? যখন কেউ তাকে ডিফাইন করে, আর যদি সে নিজেও নিজেকে ওইভাবে ডিফাইন করে। তখন। বল না বে হারামি!'

'আমি জানি না।'

'কেন! তুই কি মনে করিস লেখালেখি আমার কাছে পমেটম কিছু? যা লিখি, যেভাবে, সেসবে আমার এতবার নেই? আমি করে দেখাতে পারব না ভাবছিস?'

'আমি জানি না।'

'তুই জানিস বাবর। তুই জানিস যে যা-কিছুই আমি লিখি সর্বান্তঃকরণ দিয়েই লিখি। তুই রিয়্যালাইজ কর। আজ যে আমি লিখতে পারছি না, শুধু, এ জিনিস আর কেউ লেখেনি, আমিই প্রথম লিখছি, তাই। যেহেতু সত্য কী, তা আমি জানি না। অথচ, আমার মনে হচ্ছে, আমি সত্যের অনেক নাগালে।'

'আমি জানি না।'

'তুই জানিস। স্রেফ মুখে আনতে ডরাচ্ছিস। আমার মনে হয়, এ বিষয়ে কোনো ফিল্ম বা বই নেই বলেই ব্যাপারটাকে তুই মেনে নিতে পারছিস না। বল, ঠিক কিনা!'

'আমি জানি না।'

'আবার সেই! ওরম করছিস কেন? করিস না। দ্যাখ, সোজা তাকা আমার দিকে। চেয়ে দ্যাখ। কোথাও গরল আছে, কোনো?'

'আমি জানি না।'

'তুই জানিস। আমাদের ভাবনার মতো, এই বাঁচা, শুধু আমাদের হবে। কেউ জানতে পারবে না এই গল্পটা। তুই কি চাস-না আমি লিখে দিয়ে চলে যাই! লিখে আর বেঁচে, চলে যাই মুক্তির সন্ধানে! বল, এসব কি শুধু লেখবার জন্যে? লিখে, তোদের মতো গাণ্ডুদের পড়াবার জন্যে? আমি যা লিখি, যেভাবে, তুই জানিস, এরপর সবাই আমার মতো করে লেখবার চেষ্টা করবে। কপি করবে, প্লেজিয়ারাইজ করবে। তাহলে, মাঝখান থেকে তুই এরম করছিস কেন? কিসের ভয়?'

'আমি জানি না।'

'উফ! তুই কী বলতো! আমি তোকে এত করে বোঝাচ্ছি, তুই বুঝিস আমাকে, তবু তোর কী হচ্ছে বলতো? তোর কোনো চাহিদা নেই জানি। তোরও বউ বাচ্চা চাঁদসি ব্যাংক। অথচ অভাব একটা থেকেই গেছে। যেটাকে তুই অ্যাচিভমেন্ট বলিস, জাস্ট সেখানেই রয়ে গেছে বিশ্বমানের ফক্কা। অভাববোধ। তুই সেটা ফীল করিস, শুধু মুখে আনতে আতঙ্ক। তোর চোখের ভাষা, তোর কান্না, তোর হাহাকার, বল, আমিও কি তোর সব জানি না? বল? আব্বে, বল না বে শুয়ার!'

সে-রাতে ঠিক কী ঘটেছিল, সেটা বলছি।

হ্যাঁ। যা ভাবা যায় না বলেই ভাবতে পারেনি বাবর, তবে তাই। পিঠের মেরুদাঁড়া টানিয়ে, চোখের র‍্যাকেট উঁচিয়ে, যেন বৃথা না যায় মার, এভাবে, সে বলল, 'অ্যাড়া, তোর এই ইন্টেলেক্টের ঘি-মাখা সলিপসিস্ট আর টার্স মনোলগের রিক্সাপুলার ল্যাংচা বাংলায় তর্জমা করলে কী দাঁড়াবে জানিস?— পাপ। মোস্ট আন-ল-ফুল অ্যান্ড ইমমরাল সিন। সেটা ভেবেছিস?'

লাইটারে মৃদু চাপ। নীল ফ্লেম বেরিয়ে আসে। কমলের ঠোঁটে সিগারেট। ধরালো। ধরিয়ে, জ্বলন্ত তিলিটা দু-আঙুলে ড'লে নিভিয়ে দিল, দিয়ে, সরাসরি বাবরের মুখের দিকে : 'দ্যাখ বাবর। তুই আমার সব জানিস। স-অব। আমার হাড়হদ্দ তোর নলেজে। চাস যদি, এটাকে তুই নিজের কাছে রেখে দে। মাটিতে পুঁতে। ঝামা দিয়ে ঘিরে। কেউ জানতে পারবে না যে এখানে কোনো, ঐ তুই যাকে বলছিস, পাপের চারা, গজিয়েছিল। নে, হাপিস কর।' বলে, পরের পেগটা এগিয়ে দিল।

'মানে, তোর আত্মাটা। সেই সত্যটা, যেখানে তোকে সম্পূর্ণ পাওয়া যাবে। তাকে এভাবে পুঁতে রাখতে বলছিস! কাকে? না, এই তোর সব-জানা ইয়ারকেই। ছিঃ!'

'ছি কিসের? পাপই বা বলছিস কাকে! সিন মিন্স অ্যান অ্যাক্ট এগেনস্ট দ্য ল'জ অব রিলিজিয়ন। এ তো সেই হাজার ডিং মেরেও দরজার ছিটকিনিতে পৌঁছোয় না যার হাত, সেই টুম্পা-ভোঁদড়দের ফাংশানাল ইংলিশ গ্রামারেও আছে। আর ঈশ্বরের নিয়ম এতে লংঘন হচ্ছে বলে যদি ধরিস, তাইলেও, ঈশ্বর কী! এই শরীর। শরীরের চেয়ে বড় ঈশ্বর বা ধর্ম কিছু আছে?'

'ছিঃ!' আতঙ্ক আর ঘৃণায় চোয়াল বেঁকে যেতে চাইল বাবরের।

'আবার ছি!' কমল আরেক ফুঁক মেরে, ধোঁয়ার সর্বাংশ বাবরের কানের পাশে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'বড্ড তেঁতো, না! খুব বেশি বিব করলে দেখেছি ইন্টারজেকশানগুলো তুই দু'বার করে উচ্চারণ করিস। এই ফালকোটা এবার ছাড়। কাজের কথা কিছু ভাব। ভেবে দ্যাখ, সময়ের কী সুমহান দাবি তোর কাছে! কী তার অ্যাপিল! কী যাচনা! সময় তোর কাছে নতুন অভিধা চাইছে, জীবনের। তুইই, এই মুহূর্তে, একা, একপিস, যে সময়কে বোঝাতে পারে জীবনের থিওরেম। কি রে, পারবি না, তুই?'

ঐ প্রেতকণ্ঠ ধুলোপথের বাঁক পেরিয়ে হাই-ওয়ে ধরার জন্যে গিয়ার বদলাবে, তার আগেই বাবর ঘুরে দাঁড়িয়ে, মুখোমুখি, বেশ স্পষ্ট চোখে এতক্ষণ পর তার শেষ বাক্যটি সপ্রশ্ন দায়ের করল : 'তো, এই হচ্ছে তোর সাডেন ক্রাইসিস! নাকি, আরও-কিছু বলার আছে?'

কমল সত্যিসত্যি হাইওয়ে ধরল। মহারোডে স্পিড অব্যাহত রেখে কয়েকটা সেকেন্ড এমনি পেরিয়ে যেতে দেয় সে। তারপর, শান্ত হাতে গিয়ারের বাঁট ধরে ও পালটে : 'তোর যদি বেশিক্ষণ বসতে ইচ্ছে না করে, দেন, নো অল দ্য ইনস অ্যান্ড আউটস অব দ্য ক্রাইসিস'— অতঃপর মসৃণ সড়কে গাড়ি চালাবার মতো নির্বিকার গলায়— 'আমি ম্যারেড, তুই জানিস, আমার বউ আছে। আর বউ ব্যাপারটা হলো অনেকটা লেকল্যান্স সেলের মতো। ঘন ঘন চার্জ না করলে, বউয়ের কাছ থেকে একটা জিনিশ চিরকাল পাওয়া যায় না, ইউ নো,— ভালোবাসা,— আর'— সহসা ততোধিক স্পিড তুলে, ধোঁয়া আর গর্জন সহ সশব্দ পদাঘাতে শেষ কথাগুলো বলে গেল সে: 'ভালোবাসা ছাড়া যেহেতু আমার চলবে না, আমি লিখতে পারব না, তাই ভাবছি, ব্যাটারিটা তোকে দিয়েই একবার চার্জ করিয়ে ...' বাকি শব্দগুলো সে অনুক্তই রেখে দিল। এবং, স্টিয়ারিং থেকে হাত তুলে, এবং, ছেড়ে।

এরপর বাকরুদ্ধ মুখে বাবরের লীপ-ডান্স দেখবার মতো হবে, বলাই বাড়তি। এবং অসম্ভব বিস্ফারিত চোখে, যতক্ষণ ননস্টপ গিলে ফেলা সম্ভব, গিলে, তারপরেই ঐ ওষ্ঠলীলার পত্তন। তার মধ্যমস্তিষ্কে একটা বাজ-ই বুঝি ফাবড়ে দিয়েছে কমল। এই প্রথম। অবশ্য, কমলের ঠোঁট-নাক-কান-চোখ-থুতনি তখন ঢেকে যাচ্ছে শুধুই নীল-নীলতর ধোঁয়ায়, তার বলয়ে বলয়ে, তেমন বেশি-কিছু সে দেখতেই পাচ্ছে না। শুধু একটা অসুট ও অপরিচ্ছন্ন— 'ছিঃ!' ... আত্ম-বিবেকের গোঁতায় কাহিল আটত্রিশ বছরের পাকা-ঠোঁট থেকে লোফার-শিসের মাফিক ওই সংরাব নির্গত হয়েই যেন যৌথ ঘৃণায় বাষ্পীভূত হয়ে উবে গেল মহা-ইউনিভার্সে।

শেষ টান মেরে সিগারেটের বাট-এন্ডটা দূরে ছুঁড়ে ধোঁয়ার আস্তরণ সরিয়ে সে দেখল, নাহ, সমুখে কেহ নাই। ফাঁকা। অন্ধকারের সম্ভার সাজিয়ে ঘরের মাঝারে সে সম্পূর্ণ একা।

সে-রাতে ঠিক কী ঘটেছিল, সেটা বলছি।

গুজস্তা আর্ট ফিল্মের সাইড হিরোর মতো দরজার পাল্লায় হাত রেখে যতক্ষণ স্ট্যাচু-মতন দাঁড়িয়ে থাকা যায়, থেকে, ক্যাসমেটের ভারি নির্দোষ পর্দাটা ধাক্কা-প্রায় ঠেলে-সরিয়ে- দুলিয়ে টলমল পদে আমি বাইরবেরি ছাদে এসে দেখলুম, জারুল গাছটার মগে চড়ে চাঁদ তার চাঁদপানা মুখ নিয়ে চুপটি মেরে ব'সে।

'তুমি কি চলে যাচ্ছো?'

পায়ে-পায়ে এসে দাঁড়াই ছাদের কানাচে। সেখানে মউ গন্ধে বাতাস গাভিন।

বেমক্কা মাচকাফেরে পড়ে ভারি ঘটকর্পর লাগছে নিজেকে। এতখানি বেবাস গল্পের কেয়াস রক্তিমাত্র ছিল না। এখন পালাবার চিন্তাও খ্যাপাটে খেয়াল মাত্র। হয়ত-বা গল্পের অন্ত্যেষ্টিপর্ব দেখাবে বলেই নিয়তি আমাকে সিঁড়ির দিকে না এগিয়ে ছাদের এই কোণার অন্ধকারে স্ট্যান্ডবাই রেখে নিল। তাছাড়া, পালাবোই বা কেন, কিসের পরিত্রাণে? এতক্ষণের অন্তর্ঝড়ে ছিন্নভিন্ন কি হয়ে যায়নি মাথা? ছিন্ন, আর কুচিকুচি? আয়নায় হয়ত ধরা পড়ত মাংস-খোবলানো চোয়ালের দু'পাশ বেয়ে গড়িয়ে নামছে ক্লেদাক্ত স্বেদ, চোখের কোণে ক্লান্তির পিচুটি, আর চুল গেছে উড়ে, ভুরু নিঃশেষ।

... অথচ ... অথচ, পাশাপাশি একটা গরম অনুভূতিও,— একগোছা গনগনে প্রশ্বাসের রেষণ টের পাচ্ছি পেটের তলাট থেকে। অবিকল ঘোড়ার চালে তারা ধেয়ে আসছে মাথার পানে। সন্ত্রস্ত হতে গিয়ে কাবু-হারা আমি, যেন বিশাল পাহাড় ঠেলে উঠে আসতে চাইছে মাথা, মাথার সর্বাংশ।

'তুমি কি চলে যাচ্ছো?'

আমার পা টলছে। পেটে পাঁচ পেগের পুরকশ কাবাড্ডি। দেখেছি, নেশা আমাকে জড়াতে চাইলে আমিও জড়াতে চাই নেশাকে। প্যারাপিটে থাবা রেখে নিজেকে সামলে নেবো ভাবতে গিয়ে টের পাই মাথাও ক্রমে খুলে, ঝুলে পড়ছে নিচে, ক্রমশ নিচের দিকে। এবং মগজও হঠাৎ নিশ্চল হয়ে লটকে পড়ায় আতুর বেজায়।

'তুমি কি চলে যাচ্ছো?'

আকাশব্যাপী তারার ঝালর। অশ্বিনী ভরণী মৃগশিরা আর মঘারা লাগাতার জীবন্ত চোখে। মাঝে পানখ সাপের ডিমের মতো শাদা চাঁদ। হঠাৎ খেয়াল হলো, সেই আলো আড়াল করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে গভীর নদীর নিদাঘ কালো জলের মতো অথৈ একটি নারী। ও তার দেহ। জলেরই মতো সুঠাম অথচ টলটলে। ঈষৎ হরিণীর হাব জোগানো তেরিয়ে কাঁকাল,— তার সিলুএট, তার মাতলা ঢেউ। শাড়ির মৃদুমন্দ ওড়া-আঁচলের তলভাগে, ব্লাউজের বটম থেকে কোমরের কষি-চিহ্নের মাঝে, সোরাই-মসৃণ তলপেটে, বাটালি, কুঁদ আর জ্যাকপ্লেন দিয়ে গোঁথা যথাসম্ভব গভীর নাভি র্ত্ম,— সবই দৃষ্টে এলো ভাসানি চাঁদের যোগসাজশে। বুকের ক্লিভেজ থেকে ওপরে-ওঠা কণ্ঠার দুধারি হাড় অব্দি রিক্ত, সেখানে কিছু নেই। শুধু, সেই উজ্জ্বল নির্মল মসৃণ ত্বকপটে মিহি চাঁদ হয়ে ঝুলে আছে গাঢ় বোতল রঙের দু'গাছি পুঁতির মালা।

'তুমি কি চলে যাবে, সত্যি?' চোখের কাতর-কালো তারাদুটি যৎপরনাস্তি কাছে এনে, আমি-মাত্র-শুনতে-পাই এহেন অতি-নিভৃত স্বরে, রানী আর্জি জানায়, 'যেও না, প্লিজ!'

আমার কথা বলার দম ফুরিয়ে। কথারা ফুরিয়ে, নেশার বিশ্বস্ত ভাঁওতায় মাথা ঝিমঝিম। ওঠবার চেষ্টায় বেসামাল আরও। টলে যেতে যেতে, পড়ে যাবো বলে, পড়তে পড়তে, রানীকে, রানীর আঁচল খামচে নিজেকে সামাল দেবার ভ্রান্তে পড়ি। ফলত, আরও খানিক নুয়ে পড়লে, কচি নাসপাতির প্রায় গোলালো চিকন মুখের অগরুপ্রতিম সুরভি ও ধূসর-অন্ধকার চোখে দরাজ আমন্ত্রণ সহ নিজেকে ও নিজের অনেকখানি আমার ঝোলানো জিবের নাগালে তুলে ধরে, শিশিরসিক্ত গ্লসি-কালো অধর কাঁপিয়ে রানী বলল, 'তুমি কি সত্যি, আমাকে ছেড়ে, চলে যেতে, পারবে?'

চূড়ান্ত নেশায় বাঁধা শেকল টং করে ছিঁড়ে গেল।

'রানী!' ... অসহায় জালাধরা চোখে তাকাই আমি।

'দ্যাখো'— সেই কিশোরীর জলার্ত আঁখির মতো ঝাপসা হয়ে আসা চাঁদের আলো-ধূসরিত ফিরদৌসের ঝোঁকাঝোঁকা পাতা-আঁধারের আড়াল তমিস্রায় মূক দাঁড়িয়ে, আমি সম্মোহিতের মতো দেখলুম, পিন-আঁটা লাজুলি আঁচলখানা ব্লাউজ থেকে খসিয়ে স্বীয় বুকের অই গহীনচেরা খাঁজটুকু দেখিয়ে, কামদ ও হিসহিসে গলায় রানী আমাকে বলছে,— 'লোভ হয়নি তোমার? এক রাত, এক মুহূর্তের জন্যেও! বলো, হয়নি?'

রানী! রানী! রানী!

সহসা খুব উত্তাপ পেয়ে জলের ফোঁটারা যেমন, অবিকল সেই দ্রুতিতায় গলার সমস্ত জল ত্রস্তে শুকিয়ে নিঃশেষ। আমি একজাই বোবা হয়ে গেলুম। ...

সে-রাতে ঠিক কী ঘটেছিল, সেটা বলছি।

ঘরের মধ্যে কমল নিঃসাড় শুয়ে। যেন ঘুমিয়ে। আসলে তার চোখ এখন ততটুকুই ফাঁক, যেটুকুতে মানুষ দৃশ্যত ঘুমন্ত দেখায়। এখন নাইট ল্যাম্প বন্ধ। ঘরটা নস্যিরঙা ধূসর অন্ধকারে। কমলের পাশে তুতুলের অবুঝ পত। শরীর। ঘুমিয়ে কাদা সে সেই-থেকে। কমল চাইছিল, গোলালো ভেন্টিলেটার ফুঁড়ে ঈষৎ বিছিয়ে পড়া চাঁদের একফালি রুপোলি আলো, অন্তত। না, নেই। এমতাবস্থায় নিঃশব্দ হেঁটে বাবরকে এ-ঘরে বারদিগর প্রবেশ করতে দেখে, যাকে বলে, বজনিশ বা আক্ষরিক, এক্কেবারে ভেতর থেকে কেঁপে উঠল সে। এবং, সর্বতো।

বাবর এসে নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল। ডিভানের অপর কিনারে। মাঝখানে, বাবর আর কমলের মাঝখানে কিছুটা জায়গা অবান্তর। ওখানে রানী শোবে। রানী! রানী শোবে? কমল আরও নিঃসাড় হয়ে পড়ল। ক্রমশ অবশ ওর শরীর ও দেহাবয়ব।

রাত এখন বারোটার কম না।

অই সদরের ছিটকিনি তুলে দিচ্ছে রানী।

দ্রুত, সতর্ক হাতে, শাড়ির প্যাঁচ খুলছে রানী।

কমল নিজের তলাশি নিয়ে দেখল, শরীরে একফোঁটা আগুন নেই। সর্বাঙ্গের সমগ্রটা অবশ। দেহ নেই, হাত নেই, মাথা নেই, নুনু নেই— শুধু কোথাও আছে অথচ নেই হার্টের এককম কণা-প্রতিম হদিশও নিজের মধ্যে টের পেলে, কমলকে শেষাবধি ভাবতে হতো না যে, সে আজ, এই মুহূর্তে, নিমেষে হঠাৎ হয়ে পড়েছে এমন একজন মানুষ, কেউ, কিছুই অবশিষ্ট নেই যার। আচকাই যেন সে সর্বাংশে ফতুর হয়ে গেল।

পরক্ষণে, খোলা বাথরুমের চির-ব্যবস্থিত তির্যক আলো বা প্রচ্ছায়ার মদতে সে দেখল, আর এছাড়-বই-নেই বিছানায় বেড়ালির অতীব সন্তর্পণ-চালে উঠে আসছে, কালো বডিস আর শায়ামাত্র গায়ে, একটি, শাদা-তামাটে বলশালী রমণী গতর।

কমল তার মুখ দেখতে পেল না। ...

সে-রাতে ঠিক কী ঘটেছিল, সেটা বলছি।

অন্ধকারের অত্যাশ্চর্য কাজের মধ্যে একটি, কমল হাজার চেষ্টা করেও রানীকে দেখতে পেল না। একটা ভূতুড়ে আভাস-সহ মিহি চাদরের ফিনফিনে অভিব্যক্তি আর প্যান্টোগ্রাফে হিসহিসে শব্দ ছাড়া :

'এ্যাই! জেগে আছো?'

কমল নিরুত্তর। প্রখর নীরব নিঃসাড় শক্ত শরীর। সে নির্জীব।

'তুমি জাগবে না! দেখবে না কিছু? এ্যাই!—'

কমলের জোর ইচ্ছে করছিল প্রবল শক্তি দিয়ে হঠাৎ খামচে ধরে রানীকে। কিন্তু, সে তবু নড়ল না। নড়ার শেষ কোন তলানি-শক্তিও সে খুঁজে পেল না নিজের মধ্যে। তেমনি নিঃসাড় নির্জীব হয়ে শুয়ে রইল।

কিছুক্ষণ। নিস্তব্ধতা। নিঝুম। রুদ্ধগতি অপেক্ষা।

কমল চাইছিল রানী দ্রুত আশ্বস্ত হয়ে ওঠে যেন, যে, কমল মৃত। তার অস্তিত্বের কোনও জিনই জেগে নেই এখন। এবং, চৈতন্যের দূর প্রান্তে। গোটা পৃথিবী ঘুমিয়ে, জেগে থাকুক শুধু দুটি প্রাণী— রানী আর বাবর। কমল চাইছিল।

কমল আর বাবরের মাঝ-পরিসরে রানী। রানী চিৎবুক শুয়ে আরও ক্ষণ-কয়েক অপেক্ষা করল। তারপর হঠাৎই পাশ ফিরে শুলো। বাবরের মুখোমুখি। এবং, জড়িয়ে?

কমলের নিশ্বাস পুনরায় ফুরোতে লেগেছে।

রানীর শরীরের সঘন চাপা উষ্ণ চাঞ্চল্যে খোলস-ছাড়া সাপের মতো একটু একটু জেগে উঠছে ঐ এতক্ষণ নিসাড় ও মৃত পড়ে থাকা বাবরের শরীরপ্রতিম লাশ। যদিও প্যাসিভ, কিন্তু রানী জানে কীভাবে মবলগ ঘুম ভাঙাতে হয় পুরুষের, এবং নেশা।

হঠাৎ ভীষণ বিবমিষা জাগছে কমলের। তথা, পিত্তির দহন নির্বিশেষে। কণ্ঠা শুকিয়ে।

ক্রমশ নেশা ও ঘুমের চঙ্গুল থেকে বেরিয়ে নিজেরই লাশের ওপর উঠে বসছে বাবর। রানীর শরীর ও শারীরিক বেয়ারিঙে আধো-আধো ধাক্কা খেয়ে পুরোই পাশ ফিরে শুতে হয় তাকে। রানী ক্রমশ ব্যবায়ী, মুক্তিস্নান-পূর্ব সঘন চুমো দিয়ে পুরো-পুরো জাগিয়ে তুলতে চাইছে নেশাচ্ছন্ন নিষপ্রভ পুরুষকে। পুরুষের জিন ও পেশিকে। সে পিষ্ট হবার জন্য মুখিয়ে।

কমল আরও জানতে চাইল, কী সেই অমোঘ অনুজ্ঞা যা নারীকে সচল করে, এবং পুরুষকে মৃত। দেখল, রানী এই মুহূর্তে আর কেউ নয়। অন্তত, কমলের কেউ নয়। অন্তত, তুতুলের কেউ নয়। অন্তত, সমাজের কেউ নয়। ... সে শুধু এক পরম অর্থিত নারী এখন, পূর্ণ ও অনন্য। সে কেবল নিজের 'স্ব'কে চেনে, আর সেই 'স্ব'-এর সে আজ্ঞাবহ চারিকা মাত্র। সে দ্রুত বাবরকে পেতে চাইছে নিজের বুকে আর নিজেকে নিঙড়ে করে ফেলতে চাইছে পূর্ণত উজাড় ও নিঃস্ব। ওরা কি এখন গভীর চুমোচুমুতে মগ্ন, পরস্পর? উভয়েই কি উল। এই মুহূর্তে? ইতিমধ্যে কি ওরা ঢুকে পড়েছে একে-অন্যের বেতাব লোলাগ্রে??

এই সময় হঠাৎ অয়েল ক্লথের খড়খড়। কমল নিঃশব্দে ও দ্রুত জড়িয়ে ধরে তুতুলকেঙ্গ ঢাকা ফেলে দিয়েছে গা থেকে, ঠোঁট চকাচ্ছে।

দু'জনে, এখন, একে-অন্যের গহন বেষ্টনীমধ্যে নিথর। নিবিড় শ্বাসরোধী অপেক্ষা।

তুতুল, ক্রমে, অল্প অল্প পুনরায় থিরিয়ে। কমল ফের চিৎ হয়ে শোয়। যেন গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন, নিদ্রারই ঘোরে। তার চোখ খোলা, তার সমুখে অন্ধকার, নিশ্ছিদ্র। সে শুধু বুঝল রানী হাঁটু মুড়ে নাগাড় রুদ্ধশ্বাসে বাবরের প্রসারিত দুই জংঘার মাঝ-খাঁজে, অনড় বসে। সে রানীকে দেখতে চাইল। রানীর নয়ন ও নজর, দেখতে চাইল। রানীর চোখের পাতা। ঠোঁটের তিরতির। রানীর ঘাম। রানীর আগন ও পরিষেবা ...

কমল কিছুই দেখতে পেল না। কেবল বুঝতে পারল, দুই শরীরের অন্তঃস্থিত আগুন ও তাপ, রিরংসার ক্রমৌর্দ্ধমান ব্যাল, যা ঐ তুতুলজনিত ব্যাঘাত-পর্বে কিছু নিথর, নিস্পন্দ, আলগা ও ঢিলে হয়ে এসেছিল,— এখন অন্ধকার, নৈঃশব্দ্য ও আসঙ্গের সম্মিলিত রসায়নে পুনরপি কলাপ তুলে দাঁড়াতে লেগেছে, এবং দ্রুত।

সে এ-দণ্ডেও চেষ্টা করে কিছু দেখতে পেল না। মৃদু হিসহিসে সংলাপ শুধু :

'অ্যাই! কিছু করছো না যে!'

'আমার ভয় করছে। আমি পারব না, প্লিজ।'

'আস্তে বলো। কীসের ভয়?'

'এ হওয়া উচিত নয়। এ পাপ। এ নিয়মের বাইরে।'

স্পষ্টত, কমল বুঝতে পারছিল, রানী বাবরকে বুকের টাচ দিচ্ছে। আরও অরিজিনাল টাচ দেবে বলে, কমল বুঝতে পারে, সে নিজের ব্রেসিয়ারের হুক ছিঁড়ে ফেলবে এবার।

'নাহ, ছাড়ো!'

'না কেন?'

‘কোনো এনজয় নেই এতে। ছেড়ে দাও। ছাড়োঃ!’

কমল অসম্ভব স্পষ্ট বুঝতে পারে, রানী নিশ্চল ও বিমূঢ়। বাবর ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হঠাৎই পাশ ফিরে শুলো।

রানী তেমনি, আরো চারেক লহমা বসে থাকল ওভাবে। তারপর সেও, ফিরে এসে পাশে, পাশ ফিরে শুলো। কমলের পানে ফিরে। উদোম দেহের সর্বত্র অভিমান ও অপমানের জখম জড়িয়ে। ধূসর অন্ধকারে তার চোখ-যুতকের অস্পষ্ট ফোঁসা মূকাভিনয় শুধু। একটা বেআওয়াজ কদুষ্ণ দীর্ঘশ্বাস রিলিজ করে কমলকে আঁকড়ে ধরল রানী। নিশ্চলপ্রায় শরীর, মাথা স্থির, উষ্ণ ও রিক্ত প্রশ্বাস।

কমল চেয়ে থাকে অন্ধকারে। ফ্যালফ্যাল।

না, জানে না। কমল জানে না, কী তার কর্তব্য এখন। এ বিষয়ে কোনো পূর্বানুমান তার ছিল না। এ পরিণতি সে ভেবে রাখেনি। কেন-জানি, নিজেকে বড় অবশ, ক্লেশ, অসহায়, ত্যক্ত ও রীঢ়িত বোধ করল সে। তবে কি, তবে কি ....! সত্যিই সে জানে না কী তার করণীয় এখন। আজ সাড়ে ছ’দিবস রক্ত কষে, মাথা কষে, আত্মা ও প্লীহা কষে সে এইমাত্র কেবল জেনেছে, যে, এমন গহীন তদন্তমূলক কসরতের পরেও, এসবের কিছুই সে জানেনি। মন ও যৌন বিষয়ে প্রিলিমিন্যারি পাঠ না নিয়েই জীবন ও সময়কে নতুন অভিধা দেবে বলে নিষ্কর্ষের অন্তিম পগারে পৌঁছে গেছিল সে। শুধুই।

... রানী আর কি আমায় ক্ষমা করতে পারবে, কোনও দিন? কমল ভাবল। যেন, এই অপরূপ রহস্যঘন দেহের সমুদ্র, আত্মার বহির্বাস, যা এতদিন ছিল তার একান্ত একার, নিজস্ব, তা আজ এক বহিরাগতের কাছে অযথা বিলিয়ে দিতে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত। এই বেকসুর রমণী কখনো কি আবার ফিরে আসতে পারবে নিজের ছন্দে? ... এখনও তার সর্বা। প্রশ্নবহুল মূক, ও কাঠ মেরে। কমল দেখল। রানী তাকে জড়িয়ে ঠিকই, কিন্তু অদ্ভুত নির্জীব ও শীতল তার শরীর।

কমলও ধীরে জড়িয়ে ধরে রানীকে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। কোনো সংবহন হয় কি? ... কত কী অজানিত আর অপরিভাষিত রেখেই পুরুষকে চলে যেতে হয় নিজস্ব নারী ছেড়ে! ... আমি জানতে চেয়েছিলুম নারী। নারীর তামাম। কেননা আমি জানতে চেয়েছিলুম পুরুষ। পুরুষের সমগ্র। নিজেকে। নিজের ‘স্ব’কে। সত্যকে। ক্রমশ সত্য খুঁজতে বেরিয়ে এ আজ আমি কোথায়! ...

নিরন্তর বিবমিষা জাগছে ভেতর থেকে। নাচার গ্লানির বমনবোধ। রানীকে কিছু শিথিল দূরত্বে ঠেলে দেয় কমল। শরীরী সংস্পর্শের তফাতে। ভয়ানক ওঠানামা, বুকের। বুক গুলিয়ে, ওহ্। নিযূত ঠেলা ও আক্রোশ ধমনী থেকে। দম যথার্থই ফুরিয়ে যেন। একদলা কান্নার ঠাস কণ্ঠার আগাড়িতে ফেঁসে,— হাপিস করতে না-পারার উচাট। উফ, এ তার কী হলো! উফ, উফ, উফ! রানীর ক্ষুদে ও নির্জীব হাতখানি মুঠোয় আঁকড়ে, হঠাৎই ফুঁপিয়ে উঠল কমল।

সে-রাতে ঠিক কী ঘটেছিল, সেটা বলছি।

ঐভাবে অনেকক্ষণ নাগাড় ও অবশ শুয়ে থাকার পর আমার কান শুনতে পায়, প্রখর ডুকরে-ওঠা কান্নার অস্পষ্ট ফোঁস আর নারী সোৎকণ্ঠের রিনরিনে একটা ডাক : ‘বাবর! বাবর! শুনছো! দ্যাখো না কমল কেমন করছে— ’

ব্যাস। এইটুকুই আমি শুনেছিলুম। উঠতে গিয়ে, প্রথমেই যেটা,— দেখি, নেশা আমার আদ্যন্ত পরাস্ত। আমি এখন আমার অলিভ কর্ডুরয়ের আঁটোসাঁটো প্যান্টটা স্বচ্ছন্দে তুলে নিতে পারছি, এবং বড় হালকা, নিরবসাদ সুতরাং পুনরুজ্জীবিত লাগছে নিজেকে।

অল্প-খানিক অপেক্ষা করি ব্যাপারটা আঁচাতে। এবং,— আঁচ করে, শার্টটা কাঁধে ফেলে দ্রুত বেরিয়ে আসি ছাদে। দেখি, রাতশেষের ঝলমলে চাঁদালোকে, প্যারাপিটের ’পরে দু’পাঞ্জার ভর রেখে, টেপা-গলা মোরগের নিরুদ্ধ অশ্রুস্রোতে ধড়ফড় করছে কমল আর কমলের সর্বাঙ্গ।

'আরে, কী হয়েছে?'— কাছে গিয়ে পিঠে হাত রাখি,— 'অ্যাই অ্যাড়া! আবে, এরম করছিস কেন? কী হয়েছে?'

কমলের মুখে কথা নেই। রা নেই। বাক নিস্পৃহ। পিঠ ফুঁপিয়ে উঠতে চাইছে। চোখ ঘোলাটে। পিঠের দেখাদেখি শরীরের আর-সব জোড়ও কাঁপছে। আর, গোঙানির সদৃশ অশ্রুতপূর্ব এক ধ্বনি, যা সম্ভবত প্লীহা থেকে, অনিবার।

'তুই আমাদের ছেড়ে একা বেরিয়ে এলি কেন?' আমি ওর পিঠ ধরে ঝাঁকানি দিই,— 'দ্যাখ, তুই যেটা চেয়েছিলি, সেটা হলো? নাকি, হতে পারে? হতে নেই। ওসব বাজে জিনিস। পাপ। এখন ওঠ তো, চ, ভেতরে চ।'

কমল আমার মুখের দিকে চাইল। ফ্যালফ্যাল, আর ঘোলাটে। সত্যিই যেন কিছু আটকে আছে গলার কাছে। বের করতে পারছে না। কষ্ট। মুমূর্ষু রুগির কাতর আর্তির মতো সেই ধ্বনি নিরবচ্ছিন্ন।

'হাতটা ধরো তো রানী। বাথরুমে নিয়ে চলো। বমি করবে মনে হচ্ছে।'

রানীও ওর একটা হাত ধরে। 'অত করে বললাম, খেয়ো না বেশি। শুনলে না! তার ওপর এই এতখানি রাত জেগে ...'

কমলকে বাথরুম অব্দি টেনে নিয়ে যাই আমিই প্রধানত। রানীকে ও ঠেলে সরিয়ে দেয় সেই-মুহূর্তেও, এবং যথোচিৎ বিকৃত মুখে।

ভাবটা বমির। কিন্তু বমি নেই। চামচ কয়েক অম্লজল উগরে দিয়েই কমল দেয়াল আঁচড়ে বাথরুমের মেঝেতে বসে পড়ল। ইস, এইটুকুতেই মুখটা কেমন ফ্যাকাশে, আর ফগের মতো ঘোলাটে হয়ে পড়েছে চোখদুটো। মেরুদণ্ড ঢিলে কিংবা আলগা হয়ে পড়লে যেমন, সোজা দাঁড়াতে অব্দি পারছে না কমল।

রানী দ্রুত কাছে এসে মাথায় হাত রাখে, বুলিয়ে দেয়,— 'কিছু কষ্ট হচ্ছে সোনা! এই, তাকাও আমার দিকে। দ্যাখো, মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছো তুমি। কিছু কি হয়েছে? বলো!'

'যাহ-ও!'— কমল রানীর হাত ছাড়িয়ে, নাকি ছিনিয়ে, মাথা সরিয়ে, ঝাঁকানিও দিল খানিক সেকেন্ড,— 'আই ওয়ান্ট টু স্টে অ্যালোন রাইট নাও।'

'এখানেই বসে থাকবে ভূতের মতো?' রানীর স্বর বুজে এলো, এবং যথাঞ্চিৎ করুণ, 'তুমি আমাকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবে না জানি। কিন্তু, আমাকে বুঝবেও না। বোঝোনি তুমি। এসব ছাড়াও জীবন চলে। এটা তুমিও জানো। তবু শুধু শুধু নিজেকে কষ্ট দিলে। চলো, ওঠো তো এখন। রাত ফুরোতে চলল। গিয়ে একটু শোবে, চলো।'

'তুমি যাও।'

'না। চলো।'

'রানী, প্লিজ!'

'আচ্ছা বাবা।' সরে এলো রানী: 'যদি কষ্ট দিয়ে থাকি, ক্ষমা কোরো। কিন্তু, সত্যি, আমি এভাবে চাইনি। এ চাইনি। অ্যাকদমঈ।'

সে সরে এলে, ঠেট হিন্দী ফিল্মের মাফিক ঘুরে দাঁড়ালে, কমল কী-যেন আঁকড়ে সামলাতে চাইল, নিজেকে। পারল না। মাথাটা যাবৎ হেলে, শরীরটা যৎপরনাস্তি আড় হয়ে, লুটিয়ে পড়ল মেঝের 'পরে। সে হয়তো বারিজ মেঝে হতে শীতল শান্তি শুষে নিয়ে নিঃসাড় ঘুমে তলিয়ে যাবে আর-একটু পরেই। হয়তো। ...

রানী সরে এলো। আলো সরে এলো। পৃথিবী স'রে।

পড়ে রইল, কমল। একা।

যোজন ভাইরাস, এই বিষ অর্জন

সংবিক্তি ফিরলে কমল প্রথম যে প্রাণীটির অস্তিত্বের কথা জানতে পারে, তার নাম কমল।

নীল প্যাসেজ পেরিয়ে সে ঢুকে গিয়েছিল মৃত-আত্মার কালা গর্ভান্ধকারে। শীর্ণ গুহাপথ দিয়ে, বাহু মুড়ে, নাক রগড়ে। পরে কি কোনো শব্দ করেছিল? কিছু? কমল বলতে পারে না। ... নিশ্বাসের আওয়াজ কোনও? খুব সম্ভবত, টর্চ ফেলার আগাড়ি-মুহূর্তে একবার, ঐ স্রেফ বিশ সেকেন্ডের জন্য, ঐ প্রথম, দীর্ঘ একটা নিশ্বাস মোচন করে সে। একবারই। তারপর অতি ধীর গতিতে অসাড় নিস্পন্দ নিথর দেহকে সচল করে,— হতে পারে।

একপাল দেহাতি বাদুড় ডানা ঝাপটে পালিয়ে গেল।

কমল দেখল, আলো ক্রমে ভয়-পাওয়া কুকুরের মতো দূরে সরে যাচ্ছে। সে আর নিজেকে দেখতে পেল না। পাথরের গায়ে কিছু শুকনো খোলস ও অসংখ্য দাঁড়। সে টের পায় শুধু। টের পেলো।

চোখের তড় শুকিয়ে। ক্রমে হিমাঙ্কে সেঁদিয়ে যাচ্ছে শরীর। লাট খেয়ে। হাড় ফাঁপা ও বাতাসে অদ্ভুত বোঝাই। হঠাৎ প্রখর হালকা বোধ করল সে। হালকা। আঃ, নিজেকে বেধড়ক হালকা লাগছে এখন।

এরপর সংকীর্ণতর আরেক গুহামুখ।

কমল জানে, অন্তর্লীন বহতার এই আঁধার-পথও পেরিয়ে যেতে হবে তাকে।

ওপর দিয়ে কোনো নদীই কি বেআওয়াজ বয়ে চলেছে? সে ভাবতে চেষ্টা করল। এগিয়ে গিয়ে হঠাৎই ঝাঁপিয়ে পড়লে যেমন, মৃদু গমগম শব্দ। এবং, সেখানে, ছাত নেই। ওপরের ফাট দিয়ে চাঁদের মসৃণ আলো। রাতই কি তবে এখন? কেন-জানি মনে হলো তার।

মাটি ফিরে পেতে টর্চ ফেলল।

আলো নেই।

মাটি নেই।

নিচে গহ্বর, অতল। লম্বা পা ঝুলিয়ে দিয়েও তল মেলে না। গড়ানো পাথর নিচে গিয়ে পড়তে কয়েক লক্ষ সেকেন্ড। কমল বুঝে ফেলল, অসীম শূন্যের কোনো এক খাঁজের চঙ্গুলে সে আটকা পড়ে গেছে। তার পা অচল। ঢিলে ও অবশ হয়ে আসছে দেহ। ক্রমশ সংজ্ঞা হারিয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে সেই অসীম নিরালায় ...

দাও, যা-কিছু গোপন তোমার। সযত্নে রক্ষা করব। ...

... নিঃসীম নীরব অথৈ অন্ধকার ফুঁড়ে হঠাৎই ভেসে এলো এই কণ্ঠস্বর।

আমি কে? কী আমার গোপন?

কমল ও কমল শেষ চেতন-মুহূর্তে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকায়।

আমি কি পাপী???

উত্তর মেলে না।

কে তুমি, রক্ষা করবে আমর গোপন পাপ?

নিঃশব্দ।

জবাব দাও!

নিঃশব্দ তবুও, জবাব নেই।

জবাব দাও! জবাব দাও! জবাব দাও!

জবাব, কই, নেই তো!
মাটি নেই। আলো নেই। পৃথিবী নেই। প্রকৃতি নেই।
....
....

‘কেউ নেই, কিছু নেই,— সূর্য নিভে গেছে।’